জেলের খাতা

বিপিন চন্দ্র পাল

২য় সংস্করণ

যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড্
কলিকাতা।

প্রকাশক :
নারায়ণ পাল
যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ, ২২০, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাত-৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য—দুই টাকা

মুদ্রাকর :
জ্ঞানাঞ্জন পাল
নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোঃ লিঃ
৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল আমার বহুদিনের বন্ধু। অন্যে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু গত পনর বৎসরকাল তাঁহার হৃদয়ে ভাবের কেমন বিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি—এখনও করিতেছি। তাই তিনি জেলখানা হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার "জেলের খাতা" দেখিবার ভার যখন আমার উপর অর্পণ করেন, তখন আমি একটু সুখবোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে সময়াভাবে যেমন করিয়া দেখিয়া দিলে আমার মনোমত হইত "জেলের খাতা" আমি তেমন করিয়া দেখিয়া দিতে পারি নাই। তবে ভরসা এই যে, সমাজে এখন জহুরীর অভাব নাই, কাট-ছাট, ঘসা মাজা ভাল হউক আর নাই হউক, মাণিকের আদর অনেকেই করিবেন।

আমি যাহা ভাল বুঝি ও ভাল দেখি তাহাকে ভাল না বলিয়া, আমার সর্ব্বস্ব—আমার ইহ পরকাল যে অতি সুন্দর, অতি মনোহর, অনুপম—এই কথাটা এখন সমাজে প্রচার করিতে হইবে। যে দীনতা লাভ করিলে এমন কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হয়, এই পুস্তকে সেই দৈব দীনতার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি এক হিসাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমার সব ভাল.—কলঙ্কও ভাল গৌরবও ভাল; আমার পাণ্ডিত্যের দাবদাহ ভাল, আমার অনন্ত অতীতের অপরিমেয় শ্লাঘাও ভাল। আর ভাল আমি এবং আমার দেবতা। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ধর্ম্মের ও আত্মনিবেদনের মন্দাকিনী ধারায় এই কথাই স্বয়ং বুঝিয়াছেন, অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পাঠক পাঠিকারা বিপিনচন্দ্রের ভাবের ভাবুক হইয়া সমাজ সমষ্টির ও কৃষ্টির মর্য্যাদাবুদ্ধির পুষ্টি করিলে তাঁহার পরিশ্রমও সার্থক হইবে, আমার উৎকণ্ঠাও প্রশমিত হইবে। ইতি—

২৩শে মার্চ্চ ১৯১০ খৃঃ অঃ। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে নিবেদন

৺বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় ইংরাজের কারাগারে ছয় মাস করারুদ্ধ হ'ন। "জেলের খাতা" সেই সময়ের রচনা। প্রথম সংস্করণ ফুরাইবার পর দীর্ঘকাল পরে পুনরায় ইহা প্রকাশিত হইল। বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের বাংলা ও ইংরাজী রচনা ও বক্তৃতাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আমাদের ইহা প্রথম গ্রন্থ।

যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড্

কলিকাতা

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

সূচী

জেলে অবস্থানকালে বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত ঃ

"It was more than a year ago that I came here last. When I came here last, I was not alone; one of the mightiest prophets of Nationalism sat by my side. It was he who then came out of the seclusion to which God had sent him so that in the silence and solitude of his cell he might hear the word that he had to say. It was he that you came in your hundreds to welcome. Now he is far away separated from us by thousands of miles

"When Bipin Chandra Pal came out of jail, he came with a message, and it was an inspired message. I remember the speech he made here. It was a speech not so much political as religious in its bearing and intention. He spoke of his realization in jail of God within us all, of the Lord within the nation, and in his subsequent speeches also he spoke of a greater than ordinary force in the movement and greater than ordinary purpose before it. That message which Bipin Chandra Pal received in Buxar Jail, God gave to me in Alipur."

১৯০৯ সালে উত্তরপাড়ার মহতী জনসভায়
শ্রীঅরবিন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে।

প্রথম চিন্তা

গোটা দুই তিন কঠিন কথা

প্রথম অধ্যায়

সাকার ও নিরাকার

> "ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্
> চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনুর্দ্ধ সমান।
> তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার
> চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া, কহে নিরাকার॥" *

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার,—বহুদিন হইতে এ দেশে এ বিচার চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেই যে কেবল এক দল নিরাকারবাদী, প্রচলিত সাকারোপাসনার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। প্রাচীনকাল হইতেই এ দেশে একদল নিরাকারোপাসক দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ—(শঙ্কর গীতাভাষ্য)—বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ, এক প্রবৃত্তিলক্ষণ, অপর নিবৃত্তিলক্ষণ। এই নিবৃত্তিমার্গে নিরাকারের ধ্যান-ধারণার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক সাকারোপাসনাতে ও প্রাচীন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে,

* চৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি—প্রকাশানন্দের সহিত বিচার। চৈঃ চঃ অঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক ; তাহার আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। আধুনিক নিরাকারবাদে ও বেদান্তপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকাণ্ডেও পার্থক্য অনেক। শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, উভয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিলেও, বেদান্তের ঝোঁক নির্ব্বিশেষেরই উপরে। কিন্তু বর্ত্তমানে নিরাকারবাদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, বেদান্তের নিরাকারবাদ তাহা হইতে অনেক ভিন্ন। তত্ত্বমসি—এই মহাবাক্যই বেদান্তের শেষ কথা। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ—আত্মসাক্ষাৎকারে, অপরোক্ষানুভূতিতে,—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় ; আর সে অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মবস্তুকে জ্ঞেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই জ্ঞাতার অধীন করা হয়, তাহার স্বাতন্ত্র্য আর থাকে না। সুতরাং বিষয়জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে তাহা হইতে পারে না,—জ্ঞেয়রূপে নহে, জ্ঞাতারূপেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন বৈদান্তিক নিরাকারবাদ। এই নিরাকারবাদ অদ্বৈত-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। নিরাকারবাদ না বলিয়া ইহাকে নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদও বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও আধুনিক নিরাকার ব্রহ্মবাদ

এই প্রাচীন নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও আধুনিক নিরাকার ব্রহ্মবাদের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। আমাদের নিরাকারবাদ ঠিক নির্গুণবাদ নহে। আমাদের নিরাকারবাদ অদ্বৈতবাদের নামান্তর নহে—ফলতঃ আধুনিক নিরাকারবাদী আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদকে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু নির্গুণ নহেন। তিনি স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা। তিনি পিতা, তিনি মাতা, তিনি সখা, তিনি পরমাত্মীয়। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা। এই সকলই ভেদাত্মক, দ্বৈততত্ত্বেই এ সকলের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন নিরাকার-

বাদ অদ্বৈততত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; আধুনিক নিরাকারবাদ দ্বৈত-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ দুয়ের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ এই। দ্বৈতাদ্বৈতের বিচার এস্থলে অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। দ্বৈতবাদই সত্য, না, অদ্বৈত-বাদ সত্য,—এ প্রশ্ন এ স্থলে তোলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিচার্য্য কেবল এইটুকু—দ্বৈততত্ত্বে প্রকৃত নিরাকারবাদের প্রতিষ্ঠা হয় কি না।

আকারের অর্থ কি

যার আকার নাই, আকার সম্ভব নহে, তাহাই নিরাকার। কিন্তু এই আকার বলিতে কি বুঝি ? আকারের লক্ষণ কি ? সীমাবদ্ধ করাই কি আকারের মূল ধর্ম্ম নহে ? আকাশের আকার নাই—কিন্তু যখনই ঘটের বা পটের দ্বারা এই আকাশকে পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ করি, তখনই ঘটাকাশ-পটাকাশের উৎপত্তি হয়। অন্য ভাষায় যাহাকে dimension কহে,-তাহাই আকারের মৌলিক লক্ষণ। পরিচ্ছিন্নতাই এই dimension-এর প্রাণ। যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভেদ নাই—থাকা অসম্ভব। সুতরাং যার আকার আছে, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, তাহাই সীমা-বদ্ধ। যাহা নিরাকার তাহা অপরিচ্ছিন্ন ও অসীম। এখন প্রশ্ন এই—দ্বৈতবস্তু মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন কিনা ? আর তাই যদি হয়, তবে দ্বৈতবাদে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে কি না ? এবং তাহা হইলে, দ্বৈতবাদীমাত্রেই, প্রকৃতপক্ষে, সাকারবাদী কি না ?

দ্বৈতবাদ ও সাকারবাদ

দ্বৈতবাদ তিনটী পরস্পর পরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব সর্ব্বথাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। প্রথম ঈশ্বরতত্ত্ব, দ্বিতীয় জীবতত্ত্ব, তৃতীয় জড়তত্ত্ব। ঈশ্বর, জীব ও জড় হইতে পৃথক্ ; জীব, ঈশ্বর ও জড় হইতে ভিন্ন ;—ইহাই দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জড়ের সম্বন্ধ যেরূপই নির্দ্দিষ্ট হউক না

কেন,—যতক্ষণ জীব ও জড় হইতে তিনি পৃথক ও পরিচ্ছিন্ন,—ততক্ষণ জীব ও জড়ের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ। আপাতত ইহাই দ্বৈত সিদ্ধান্তের অপরিহার্য্য পরিণাম বলিয়া সকলেরই মনে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বকে কোনরূপে সীমাবদ্ধ করিলে, তাহার সত্য নষ্ট ও মর্য্যাদা হানি হয়। সুতরাং দ্বৈতবাদী, ঈশ্বরতত্ত্বের অসীমত্ব ও সর্ব্বথা ব্যাপকত্ব রক্ষা করিবার জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, জীব ও ভগবানের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহারা কোনো না কোনো আকারে সাকারবাদও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখি যে, যেখানেই বিশুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেইখানেই কোনো না কোনো আকারের সাকারবাদ অবলম্বিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয়ান্ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব

পাদ্রিরা যাই বলুন না কেন,—এ তত্ত্বের অনুশীলন যাঁরা করেন, তাঁরা কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে খৃষ্টতত্ত্বের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পান। বাহিরের সাদৃশ্যের—কৃষ্ণের জন্মলীলা ও খৃষ্টের জন্ম-বিবরণের মধ্যে যে অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায়,—কংশ ও হীরডের কাহিনী,—এ সকলের মূল কি, পণ্ডিতেরা তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে বিচার এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। তত্ত্বের দিক্ দিয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ই ভক্তি-পন্থা, সুতরাং উভয়ই সমজাতীয় ধর্ম্ম, এ সাদৃশ্যের ইহা এক কারণ। আর ভক্তি-পন্থা বলিয়া, উভয়ই শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী এবং দ্বৈতসিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। এই জন্য খৃষ্টীয়ান ও বৈষ্ণব উভয়েই এক অর্থে সাকারবাদী।

খৃষ্টীয় সাকারবাদ

বৈষ্ণবেরা ইহাতে লজ্জিত নহেন, জানি। কিন্তু খৃষ্টীয়ানেরা এ কথাতে নিরতিশয় ব্যথিত হইবেন। তাঁহাদিগকে ব্যথিত করা আমার ইচ্ছা নহে। সাকারবাদ বলিতে, এখানে আমি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের উপাসনা বা প্রচলিত প্রতিমাপূজা নির্দ্দেশ করিতেছি না। খৃষ্টীয়ানেরা যে ঈশ্বরকে জড়-আকার সম্পন্ন মনে করেন, এমন কথা আমি বলি না। আর খৃষ্টীয়ান বন্ধুগণ যদি বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা ভাল করিয়া, সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া, করেন তবে এও দেখিবেন যে বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরে কোন প্রকারের জড় স্বভাব আরোপিত বা কল্পিত করেন না। বৈষ্ণব ঈশ্বরতত্ত্ব সাকার বটে, কিন্তু চিদাকার। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বও কি তাহাই নহে?

বাইবেল কি বলে

বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত হয়। এক পুরাতন ইহুদাধর্ম্মের ঈশ্বরতত্ত্ব, আর এক যিশুখৃষ্ট ও তাঁহার প্রথম শিষ্যদিগের বা নিউ টেষ্টেমেণ্টের ঈশ্বরতত্ত্ব। ইহুদার ঈশ্বরতত্ত্ব যে একান্ত নিরাকার নহে, পণ্ডিতেরা এখন প্রায় একবাক্যে এ কথা স্বীকার করেন। পুরাতন পুস্তকে বা ওল্ড্ টেষ্টেমেণ্টে ঈশ্বরের কোনো আকার নির্দ্দেশ করে না, সত্য; কিন্তু নানাভাবে নানাদিক্ দিয়া, তাঁহাতে মানবধর্ম্ম আরোপিত করে, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং ইহুদার ঈশ্বরতত্ত্ব নিতান্ত নিরাকার এমন সিদ্ধান্ত হয় না। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর সন্দেহ নাই,—কিন্তু ইহাও একান্ত নিরাকার নহে।

খৃষ্টীয় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি

খৃষ্ট-পন্থা ভক্তি-পন্থা; সুতরাং এখানে ভগবদৈশ্বর্য্যের অনুশীলন স্বাভাবিক; ইহুদার ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবদৈশ্বর্য্যের বিস্তর বর্ণনা আছে,—

দাউদের গীতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল বর্ণনা সহজ ও স্বাভাবিক। আমাদের শ্রুতিতেও এই শ্রেণীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অতি পরিস্ফুট দেখিতে পাই। কিন্তু খৃষ্টীয় ভগবদৈশ্বর্য্যের অনুশীলন, বৈদিক নহে, পৌরাণিক।

ঈশ্বরের সিংহাসন

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জোহন লিখিত Book of Revelation—বর্ত্তমান খৃষ্টীয়-ধর্ম্মগ্রন্থের শেষ পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জোহন অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে ঈশ্বরের দরবারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অধ্যাত্মশক্তি লাভ করিয়া দেখিলেন—A throne was set in heaven and One sat on the throne—. স্বর্গে (আকাশে?) একটা সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং "একজন" ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। এই "একজনের" কোনো বিশেষ আকারের বর্ণনা নাই, কিন্তু তাঁহার আভার বর্ণনা আছে।

And He, that sat, was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.

"আর যিনি বসিয়াছিলেন তাঁহাকে "জ্যাস্পার" বা "সার্ডিন্" মণির মত দেখাইতেছিল; ঐ সিংহাসনের চারিদিকে মরকতের ন্যায় আভাযুক্ত ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছিল।"

And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

আর এই সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ, বজ্রনিনাদ ও বিবিধ বাণী প্রসৃত হইতেছিল, এবং এই সিংহাসনের সম্মুখে সাতটি দীপ জ্বলিতেছিল। এই সপ্ত দীপ ঈশ্বরের সপ্তপ্রাণ বা আত্মা।

জোহনের ঈশ্বর সাকার না নিরাকার

জোহন যদিও ঈশ্বরের আকার অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন, তথাপি এই ঈশ্বর যে একান্ত নিরাকার নহেন, এই বর্ণনায় ইহা অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হয়।

প্রথমত সিংহাসনে বসিতে যাইয়াই তিনি দেশে আবদ্ধ হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত তাঁহার সপ্ত 'স্পিরিটের' উল্লেখ হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরকে এই 'স্পিরিট'রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। God is Spirit and ye shall worship God in Spirit and in Truth.—ঈশ্বর স্পিরিট, তোমরা স্পিরিটে ও সত্যভাবে তাঁহার ভজনা করিবে। এই স্পিরিট বস্তু যে কি, নির্দ্ধারণ করা কঠিন। স্পিরিট বলিতে প্রাণ বুঝায়, আত্মা বুঝায়, শৌর্য্য বুঝায়, শক্তি বুঝায়, অন্তরের ভাবও বুঝায়। আমাদের আত্মা শব্দ যেমন বহু অর্থ-ব্যঞ্জক, ইংরাজী স্পিরিটও সেইরূপ। মোটের উপর God is Spirit, ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, এই বলিলেই, বোধ হয়, ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হয়। তোমরা প্রাণের সঙ্গে, সত্যভাবে, তাঁহার ভজনা করিবে। অন্ততঃ যিশু এই স্পিরিট শব্দ দ্বারা ঈশ্বর নিরাকার এমন অর্থ ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, মনে হয় না। কারণ, এরূপ বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি ইহুদীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। আর যিশুর সময়ে ইহুদায় কোনোপ্রকারের সাকারোপাসনা প্রচলিত ছিল না। ইহুদাধর্ম্ম সে সময়ে বাহ্য ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ হইয়া প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তর্মুখিনতা লোপ পাইয়াছিল। যিশু সর্ব্বতোভাবে ইহুদার এই বহির্মুখিনতারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন।

সুতরাং—God is Spirit—ইত্যাদি উপদেশ সাকারোপাসনার প্রতিবাদ-রূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। সে যাই হোক, এখানে জোহন ঈশ্বরের সপ্ত স্পিরিট বা সপ্তপ্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সপ্তপ্রাণ, Seven Spirits of God সপ্ত প্রদীপ হইয়া এই সিংহাসনের সম্মুখে জ্বলিতে-ছিল। ঈশ্বরের অঙ্গকান্তিরও বর্ণনা আছে,—Was to look upon like a jasper or sardine stone—কেবল অঙ্গের বর্ণনাই নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ঈশ্বর-স্বরূপের যে আভাস এখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহা চাক্ষুষভাবে নিতান্ত স্থূল অর্থে সাকার না হইলেও, একান্ত নিরাকার, এমনই কি বলা যায়? ফলত, জোহন যখন বলিতেছেন যে—

I saw in the right hand of Him that sat on the throne a book.

যিনি সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ দিকে আমি একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম—তখন তাঁহার আকার প্রতিষ্ঠারই বা বড় বেশী বাকী রাখিয়াছেন কৈ? অন্তত বাম দক্ষিণ নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা মানিতেই হইবে। অবশ্য "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা সকল পৌরাণিক কাহিনীতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

খৃষ্টের মূর্ত্তি

জোহন ঈশ্বরের কোনো আকারের উল্লেখ না করিলেও খৃষ্টকে নিতান্ত সাকাররূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। খৃষ্টের ইহলোকে মানুষী দেহ ছিল। দেহ স্বর্গে দেখা গেল না। জোহনের উক্তি পাঠে মনে হয় যে, খৃষ্টের মানুষী দেহ, তাঁহার স্বরূপ-দেহ নহে, যদিও ঐ রূপেতেই তিনি স্বর্গারোহণের পরেও শিষ্য-মণ্ডলী সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহাদের প্রতীতির জন্য। স্বর্গে, ঈশ্বরের সিংহাসনে,—তিনি

স্বরূপত বিরাজ করিতেছিলেন। এই স্বরূপ তাঁর মেষরূপ, সপ্তশৃঙ্গযুক্ত ও সপ্তচক্ষুষ্মান।

And I beheld, and lo! in the midst of the throne...... stood a Lamb as it had been slain, having seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.

চিৎ-আকার

কিন্তু স্থূল-দৃষ্টিতে যদিও এ সকল আপাতত স্থূল বলিয়াই বোধ হয়, ফলত জোহনের এই বর্ণনাতে কোনো তত্ত্বজ্ঞ খৃষ্টীয়ানই চাক্ষুষরূপ কল্পনা করেন না। ঈশ্বর নিরাকার—"স্পিরিট"—; যিশুও ঈশ্বরেরই অঙ্গ, ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, ঈশ্বর হইতে আকারে (Hypostatisএ) ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপত একাত্ম ও একই রূপ; সুতরাং যিশুও নিরাকার—"স্পিরিট"; কিন্তু এ নিরাকার চিদাকার অস্বীকৃত হয় না। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব, খাঁটি নিরাকার নহে, কিন্তু চিদাকার সম্পন্ন। বৈষ্ণবতত্ত্বও তাহাই।

নিরাকার—অতীন্দ্রিয়

মোট কথা, দেখিতে পাই এই যে, দ্বৈতবাদে যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহা প্রকৃত অর্থে একান্ত নিরাকার না হইলেও, অর্থাৎ জীবের ও জড়ের পক্ষে তাহার ঐকান্তিক বিভিন্নতা নিবন্ধন, এই তত্ত্ব স্বল্পবিস্তর সীমাবদ্ধ হইলেও, নিরাকার বলিতে খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ কেবলই অতীন্দ্রিয় বুঝিয়া থাকেন। আর তাই যদি হয়, তবে যাঁহাদিগকে সাকারবাদী বলা হয়, তাঁদের, সকলের সঙ্গে না হউক, অন্তত অনেকেরই সঙ্গে এই সকল নিরাকারবাদীদের বিবাদের মূল নষ্ট হইয়া যায়। কারণ,

বৈষ্ণব প্রভৃতি সাকারবাদিগণ কেহই ঈশ্বরে প্রাকৃত আকার আরোপ করেন না।

দ্বৈতবাদে ঈশ্বরতত্ত্ব

বিশেষত সকল দ্বৈতবাদীই প্রতিমার উপাসনা করেন না। কিন্তু দ্বৈতবাদেই, অলক্ষিতেই হউক অথবা জ্ঞাতসারেই হউক, ঈশ্বরে নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কোনো না কোনো আকার আরোপিত হইয়া থাকে। আর ইহা দেখা যায় যে, যে ঈশ্বরবাদ সাকারবাদের যত তীব্র প্রতিবাদ করে, তাহাই স্বয়ং সে পরিমাণে সাকার।

ফলত, যে সকল ধর্ম্মে প্রতিমা-পূজাকে পাপ বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলে, তৎসমুদায়েরই ঈশ্বরতত্ত্ব কোনো না কোনো আকারে সাকার। বাইবেলের পুরাতন পুস্তকে, ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্ত্তি রচনা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিষেধ ইহুদী ধর্ম্মের। মোহম্মদীয় ঈশ্বরতত্ত্ব বহুল পরিমাণে ইহুদীয় ঈশ্বরতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইস্‌লামেও প্রতিমূর্ত্তি রচনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই নিষেধের মূল কি ?

ইহুদীর দশাজ্ঞা

ইহুদীর গ্রন্থ হইতে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মগ্রন্থের "দশাজ্ঞা" সংগৃহীত। বাইবেলে বলে,—

And God spake all these words saying,

I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Thou shalt have no other gods before me.

Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that

is in the earth beneath, or that is in the water undei the earth.

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them ; for I, the Lord thy God, am a jealous God.

খৃষ্টীয়ানেরা এই "আজ্ঞার" বলেই সাকারোপসনাকে পাপ বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু ইহুদা ধর্ম্মকে প্রকৃতপক্ষে একেশ্বরবাদ বলা যায় কি না, পণ্ডিতেরা এখন এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন। ফলতঃ পুরাতন বাইবেল পাঠে, ইহুদার ঐকান্তিক একেশ্বরবাদের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহুদা ধর্ম্ম জাতিগত ধর্ম্ম,—ইংরেজীতে ইহাকে এথ্‌নিক রিলিজিন—Ethnic religion কহে। এই সকল এথ্‌নিক বা জাতীয় বা ন্যাশন্যাল ধর্ম্মের লক্ষণই এই যে, এ সকলে অপরাপর জাতির বা দেবতাদির সত্য বা অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। ইহুদার ঈশ্বর ইহুদার,—মিশরের ঈশ্বর মিশরের। ইহুদার পক্ষে মিশরের ঈশ্বরের ভজনা পাপ, বিজাতীয় দেবতার উপাসনা একান্ত নিষিদ্ধ। ইহাই প্রাচীন ইহুদার "একেশ্বরবাদের" অর্থ। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা, এই জন্য ইহুদার-ধর্ম্মকে একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম, বা মনোথিইজম্ (Monotheism) বলিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা ইহাকে এখন একদেবোপাসনা বা মনোল্যাট্রি Monolatry বলিয়া থাকেন।

একদেবোপাসনা

এই একদেবোপাসনায় অন্য দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না, অপর দেবতার আরাধনা মাত্র নিষিদ্ধ হয়। প্রাচীন ইহুদা ধর্ম্মে অপর দেবতার অস্তিত্ব পরিষ্কাররূপে মানিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহুদার দেবতা যে, এই সকল অপর দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। ক্রমে ইহুদার দেবতাকে অপর সকল দেবতার

উপরে স্থাপন করিবার চেষ্টা ফুটিয়া উঠে। দাউদের গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

In the council of the gods sits God : He judgeth among the gods.

দেবতাদের সভায় ঈশ্বর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বিচার করিতেছেন, আর বলিতেছেন—

How long will ye judge unjustly—

আর কত কাল তোমরা অন্যায়রূপে লোকের বিচার করিবে?

এবং শেষে দেবতাদিগকে শাসাইয়া ভয় দেখাইতেছেন, তাঁরা যদি অন্যায় পথ বর্জ্জন না করেন তবে—

I have said ye are gods, and all of you are children of the Most High ; but ye shall die like men, and fall like one of the princes.

যদিও আমি বলিয়াছি যে, তোমরা অমর, এবং সত্যই তোমরা সকলে সর্ব্বোত্তম পুরুষের সন্তান, কিন্তু তথাপি তোমরা মনুষ্যের ন্যায় মরিবে এবং এই সংসারের রাজাদের ন্যায় তোমাদের অধঃপতন হইবে।

এস্থলে একরূপ বহুদেববাদেরই আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা বহুদেববাদ নহে। দেবতার অস্তিত্ব মানিলেই বহুদেববাদী বা polytheist হয় না। একেশ্বরবাদের সঙ্গে যেমন মানবের অস্তিত্বের কোনো বিরোধ নাই, মানবের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও উন্নততর যদি কোনো লোক থাকে, তাহই বা বিরোধ হইবে কেন? হিন্দুদের যাঁরা বহুদেব-বাদী কহেন, তাঁরা দাউদের এই গীতকে প্রমাণ্য খৃষ্টীয় শাস্ত্র বলিয়া যদি স্বীকার করেন, তবে খৃষ্টীয়ানদিগকেও বহুদেববাদী বলিতে বাধ্য হইবেন। ফলত খৃষ্টীয়ান ও হিন্দু, দুয়ের কেহই বহুদেববাদী বা পলিথিইষ্ট নহেন।

কিন্তু এখানে (৮২ দাউদের গীত) যদিও ইহুদার ঈশ্বরের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, বাইবেলের পুরাতন পুস্তকের আদি-ভাগে তাহাও দেখা যায় না। সেখানে ইহুদার ঈশ্বর ইহুদারই ঈশ্বর, ইহুদারই পূজ্য, ইহুদীদিগের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ সম্পর্ক, এই মাত্রই দেখি। অপর জাতির অন্য দেবতা আছেন, থাকুন; যতদিন সে সকল জাতি ইহুদার সঙ্গে বিরোধ করিতে না আসে ও ইহুদার উন্নতির পথে না দাড়ায়, ততদিন ইহুদার ঈশ্বরও সে সকল জাতির দেবতার সঙ্গে কোনো প্রকারের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন না।

এথ্‌নিক বা সামাজিক ধর্ম্ম

বস্তুত এথ্‌নিক ধর্ম্মমাত্রেই সামাজিক বন্ধন রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা দৃষ্ট হয়। সমাজ-বন্ধনের উপরেই এথ্‌নিক ধর্ম্মসকল প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমাজের ঘননিবিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এথ্‌নিক ধর্ম্ম সর্ব্বদাই সচেতন থাকে। অন্য সমাজের সঙ্গে আপন সমাজের লোক যাহাতে না মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে, এই জন্য এথ্‌নিক ধর্ম্মে নানাবিধ বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহুদার দশ আজ্ঞায় সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে যে আদেশ দেখিতে পাই, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অপর দেবোপাসনা নিবারণ করা, সাকারবাদ পরিহার করা নহে। কারণ, যে জিহোবা এই আজ্ঞা প্রচার করেন, তিনি স্বয়ংই জড় আকারবিশিষ্ট হউন বা না হউন, অন্ততঃ পরিচ্ছিন্ন স্বভাবসম্পন্ন এবং সেই অর্থে যে অবশ্যম্ভাবি-রূপেই সাকার, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কেবল তাহাই নহে, মুসাই এই দশাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। জিহোবা যে মুসার অন্তরে এই সকল বিধি প্রকাশ করেন, তাহা নহে। মুসা আমাদের ঋষিদের ন্যায় মন্ত্র "দর্শন" করেন নাই। জিহোবা দুই খণ্ড প্রস্তর ফলকে এই দশটী আজ্ঞা আপনার অঙ্গুলি দ্বারা খোদিত করিয়া মুসার হস্তে প্রদান করেন।

And He gave unto Moses, when he had made an end of commuuning with him upon Mount Sinai, two tables of stone, *written with the fingers of* God.

ইহুদার ঈশ্বর যে নিতান্তই "সাকার" ছিলেন, এর চাইতে তবে দৃঢ়তর প্রমাণ আর কি দেওয়া যাইতে পারে? হিন্দু সাকারবাদও এর চাইতে বেশী "সাকার," এ কথা বলা যায় কি না সন্দেহ। জিহোবার সাকারত্বের আরো অনেক প্রমাণ আছে, ইহুদার ঈশ্বরতত্ত্বের অনুশীলনের অবসর পাইলে সে সকল বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব

খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ইহুদীর ধর্ম্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহুদীর জিহোবাকেই খৃষ্টীয়ানেরাও ঈশ্বর বলিয়া মানেন; এবং এই দশাজ্ঞা ও পুরাতন বাই-বেলের সকল কথাই তাঁরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। নূতন পুস্তকের বা নিউ টেষ্টেমেণ্টের বিশেষত্ব যিশুর অবতারতত্ত্ব। ইহুদীর ধর্ম্মে অবতারবাদের নামগন্ধ নাই। ফলতঃ ঈশ্বর যতদিন কোনো না কোনোভাবে চাক্ষুষ থাকেন, সাক্ষাৎভাবে যখন তাঁহার দর্শন লাভ ও উপদেশ শ্রবণ সম্ভব হয়, ততদিন অবতারের প্রয়োজনই হয় না। দেবতা যখন একান্ত অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়েন, তখনই তাঁহার সঙ্গে মানুষের

যোগ স্থাপন ও রক্ষা করিবার জন্য নবী বা প্রফেট্, পয়গম্বর ও অবতারাদির প্রয়োজন হয়। ইহুদীর ঈশ্বর প্রথমে ইহুদী-সমাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতেন। এমন কি কখনো বা তাঁহাদের সঙ্গে হাতাহাতি কুস্তি কসরৎ করিতে আসিতেন। সে অবস্থায়, কাজেই পয়গম্বর বা অবতারের আবশ্যক হয় নাই। ইহুদার ঈশ্বর যখন লোকচক্ষুর একান্ত অতীত হইয়া গেলেন, তখন হইতে ইহুদা-সমাজে নবী বা প্রফেটদিগের আবির্ভাব আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের "বাণী" আসিয়া ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ইহুদা-সমাজে তাঁহার আদেশ প্রচার করিতে লাগিল। তখন হইতে এই সকল নবী বা প্রফেট বা প্রবক্তাই ইহুদাধর্ম্মের লৌকিক অবলম্বন হইলেন। কিন্তু এই নবীদিগের সময় হইতেই, কালক্রমে ইহুদার উদ্ধার-সাধনের জন্য জিহোবার নিকট হইতে একজন মিসায়া বা মসী, বা বিশেষ দূত, আবির্ভূত হইবেন, এ ভাব ইহুদা-সমাজে অল্পে অল্পে জাগিতে আরম্ভ করে। তাঁহার আদি ইহুদী শিষ্যগণ যিশুকে এই মসী বা মিসায়ারূপেই গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নিকটে যিশু "ঈশ্বরের সন্তান" রূপেই প্রকাশিত হন। বাইবেলের পুরাতন পুস্তকে দেবদূতদিগকে বারম্বারই ঈশ্বরপুত্র আখ্যা দিয়াছে। ইহুদী ভাষায় ইঁহাদিগকে—"বেনে ইলোহিম্"—বলিত। যিশু স্বয়ং এই উপাধি গ্রহণ করেন—আপনাকে ঈশ্বরপুত্র বা সন্ অব্ গড্ Son of God বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার ইহুদী শিষ্যেরা ঈশ্বরপুত্র বলিতে প্রবক্তাগণকে কথিত মসী বা মিসায়া বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম এই ঈশ্বরপুত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যিশুর ইহুদা শিষ্যগণের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয় না;—প্রকাশ্যভাবে যিশুর ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই দৃষ্ট হয়।

In the beginning was the Word and the Word was ith God, and the Word was God.

আদিতে "বাক্য" ছিল, এই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং এই "বাক্য"ই ঈশ্বর ছিল। এবং এই "বাক্য"ই যিশুরূপে অবতীর্ণ হয়। গ্রীসীয় ভাষায় লগস্ Logos শব্দের ইংরাজী অনুবাদ Word ; পাদ্রিরা বাংলাতে ইহাকেই "বাক্য" বলিয়াছেন। এই লগস কথা গ্রীসীয় দর্শনের কথা। লগসবাদ গ্রীক্ তত্ত্ববিচারের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহার আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পণ্ডিতেরা এখন প্রায় একবাক্যে এ কথা স্বীকার করেন যে, খৃষ্টীয় লগসবাদ, যাহার উপরে যিশুর দেবত্ব ও অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জোহন কিম্বা যিনিই খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের এই চতুর্থ পুস্তক রচনা করুন না কেন, ইহা গ্রীক্ সাধনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহুদার প্রাচীন তত্ত্ব-বিচারে ইহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রীকেরা নিতান্তই সাকারোপাসক ছিলেন। গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞানীরা বিবিধভাবে এই সাকা-রোপাসনার দেবদেবীর ব্যাখ্যা করিয়া, গ্রীসের উচ্চতর তত্ত্বের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহুদা ধর্ম্মে ও ইস্‌লামে যেভাবে সাকারবাদ একান্তরূপে বর্জ্জনের চেষ্টা দেখা যায়, গ্রীসে তাহা কখনো দেখা যায় নাই। এই বিষয়ে গ্রীসের ও ভারতবর্ষের আর্য্যগণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ে খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, সুতরাং ইহা যে নিতান্ত নিরাকার নহে, এ আর বিচিত্র কি!

খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব, সাকার—নিরাকার

ফলতঃ তত্ত্ববস্তু, যাহা দ্বারা তাত্ত্বিকেরা এই জটিল বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা শুদ্ধ নিরাকারও নহে, শুদ্ধ সাকারও নহে; তাহা সাকারে নিরাকার ও নিরাকারে সাকার। আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষাতে এই তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, স্বরূপত তত্ত্ববস্তু নিরাকার, তটস্থ লক্ষণায় সাকার।

অর্থাৎ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি এই তত্ত্বকে ধরিতে যাই, তাহা হইলে, তাহাকে নিরাকাররূপেই ধরিতে হয়; কিন্তু এ নিরাকার অর্থে তখন বস্তুত নির্গুণ হইয়া দাড়ায়। কিন্তু বিশ্বের পরিণাম ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া, বিশ্বের কারণ, বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতিরূপে যখনই এই পরমতত্ত্বকে ধরিতে যাই, তখনই তাহাকে সগুণ অর্থাৎ সাকারভাবে ধরিতে হয়। এখানেও এক অর্থে এই তত্ত্ব নিরাকার বটে; সে অর্থ এই যে, ইহা কোনো আকার-বিশেষে আবদ্ধ নহে, অথচ সকল আকারেই বর্ত্তমান। স্বর্ণের যেমন নিজস্ব কোনো আকার নাই;—স্বর্ণ গোল, কি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ, এ কথা বলা যায় না; অথচ কঙ্কণ, বলয়, হার, কুণ্ডলাদি সকল সাকার;—আমাদের দেশের দার্শনিকেরা তত্ত্ববস্তুকেও সেইরূপ সাকার-নিরাকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব যে এভাবে সাকার ও নিরাকার, এমন বলা যায় না। কিন্তু অন্যভাবে ইহা যে নিতান্ত নিরাকার নহে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

খৃষ্টীয়ান ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটি

খৃষ্টীয়ান ঈশ্বরতত্ত্ব, খৃষ্টীয় ত্রিত্ব-বাদে বা ট্রিনিটিতেই বিশদরূপে ধরিতে পারা যায়। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,—এই তিনে মিলিয়া খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটি, ত্রীশ্বরবাদ বা ট্রাইথিজ্‌ম নহে; পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা, এ তিন একান্ত পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, একই তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। স্বরূপত এ তিনই এক, প্রকাশে পৃথক। One in *Ousia*, different in *hypostatis*; *Ousia* ও *hypostatis*, উষিয়া ও হাইপোষ্টেটিস,—এই দুইটী গ্রীক্ শব্দের দ্বারা খৃষ্টীয়ান তত্ত্বজ্ঞানি-গণ খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। Ousia—উষিয়া শব্দের ইংরাজী অনুবাদ Essence, আমরা যাহাকে স্বরূপ বলিতে

পারি ; Hypostatis—হাইপোষ্টেটিস্ শব্দের ইংরাজী Appearance, আমরা যাহাকে প্রকাশ বলিতে পারি। অতএব পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা, —ইহারা স্বরূপত এক, কিন্তু প্রকাশে ভিন্ন। পুত্রকে পিতারূপে গ্রহণ করা, খৃষ্টীয় সাধনায় অতি গুরুতর অপরাধ, অথচ পুত্রের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিয়া কেহ খৃষ্টীয়ান থাকিতে পারে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকাশের দিক দিয়া পিতাপুত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা, ইহাও নিত্য। নির্গুণ ব্রহ্মবাদে প্রকাশ মাত্রকেই মায়িক বলিয়া, তাহার পারমার্থিক সত্য অস্বীকার করে। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা, তাহাকে এইরূপ মায়িক বলে না, তাহা পারমার্থিক। মায়িক সৃষ্টিতেই বস্তু ও তাহার প্রকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অস্থায়ী ও আকস্মিক ; এখানেই স্বরূপে ও রূপে প্রভেদ আছে। মায়াতীত যে পরমতত্ত্ব, তাহাতে এই সম্বন্ধ নিত্য ও সত্য, সেখানে যাহা রূপ তাহাই স্বরূপ। ইহাই আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তও কতকটা এই রূপই। Hypostatis ও Ousia দুই নিত্য ও স্থায়ী। অনাদিকাল হইতে, ঈশ্বর পিতারূপে, যিশু পুত্ররূপে ও পবিত্রাত্মা তাঁহাদের উভয়ের অঙ্গরূপে, এক ও পৃথক হইয়া বাস করিতেছেন। জোহনের লিখিত সুসমাচারের প্রথমেই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে :—In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God.

এই ত্রিত্ববাদের আলোচনাতে আমরা দেখিতে পাই যে, খৃষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্বও ঐকান্তিকভাবে নিরাকার নহে। কারণ এখানে "স্বরূপত" এক হইয়াও, যখন ঈশ্বর ও যিশু ও পবিত্রাত্মা, "রূপত" বা Hypostatis এ নিত্যকালেই পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া আছেন, তখন "রূপত" অন্তত এই তিন তত্ত্ব যে পরস্পর হইতে পরিচ্ছিন্ন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব মাত্রেই প্রকৃতপক্ষে

সাকার। তবে জড় আকারসম্পন্ন এই অর্থে এস্থলে, সাকার শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সাকার বলিতে চিদাকারও বোঝায়। আর আমাদের দেশের শাস্ত্রেতেও সাকার বলিতে প্রকৃত পক্ষে চিদাকারই ব্যক্ত হয়, জড়াকার নহে। এবং এই চিদাকার অর্থে, খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বও সাকার, অথবা নিরাকারে-সাকার বা সাকারে-নিরাকার।

খৃষ্টীয় সাধনায় সাকারবাদ

আর তত্ত্বেতে যদিও যিশু চিদাকার সম্পন্ন বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত হন, খৃষ্টীয় সাধনাতে ফলত তাঁহাকে মানবাকারেই প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা এদেশে, সাধন-ভজন বলিতে যাহা বুঝি, খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যাথলিক মণ্ডলীতেই কেবল তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাই। প্রোটেষ্টেণ্ট্ মণ্ডলী মধ্যে বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনাই প্রধান, এমন কি একমাত্র সাধন-ভজন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংলণ্ডে, আংলিকান্ দলের মধ্যে এর চাইতে একটু বেশী ভজননিষ্ঠা দেখা যায় বটে। আমাদের এদেশে যে সকল প্রোটেষ্টেণ্ট্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক আছেন, তন্মধ্যে অক্সফোর্ড মিশনের প্রচারকেরা এই আংলিকান্ দলভূক্ত। ইহাদের মধ্যে অনেকটা আচার নিয়মাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহারা অনেকটা রোমান্ ক্যাথলিক্‌দিগেরই মত। রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয় মণ্ডলীতে যিশুখৃষ্টের বিশেষ ভজনা হয়। এবং ইঁহারা খৃষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করেন ও আপনাদের উপসনালয়ে যিশুখৃষ্টের, এমন কি যিশু-মাতা মরিয়মের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করেন না। সুতরাং ইহাদের খৃষ্টোপাসনা যে সাকার, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

আর প্রোটেষ্টেণ্টগণ যদিও খৃষ্টমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ভজনা করেন না, কিন্তু ক্রুশকাষ্ঠে আত্মবলিদান করিয়া পুণ্যচরিত্র যিশু জগতের পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন।

Passion and Christ—যিশুর এই আত্মবলিদান সতত চিন্তা করিয়া যিশুর শোণিতে আপনাকে শুদ্ধ করিবে,—প্রোটেষ্টেণ্ট খৃষ্টমণ্ডলী সকলেরই গভীরতম ধর্ম্মোপদেশ ইহাই! আর এই ভাবটী আয়ত্ত করিতে গেলেই যিশুর মূর্ত্তি ধ্যান করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব কোনো না কোন আকারে খৃষ্টীয় সাধনাও যে সাকারভাবাপন্ন ইহা মানিতেই হয়। তবে যে সকল খৃষ্টীয়ান সাধনজ্ঞানের ধার ধারেন না, কেবল চরিত্র-শোধনে যাঁদের সমুদায় ধর্ম্মচেষ্টা পর্য্যবসিত হয়, যাঁরা ধর্ম্মকে ভাবোদ্ভাসিত মরালিটিতে—মাথু আর্‌নল্ড যাকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন—সেই morality lit up by emotion—অধ্যাত্ম সম্পদ জ্ঞানে তাহারই অনুশীলন করেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয়ান সাধক বলিয়া না ধরিলেও চলে।

অধ্যায়

অবতারবাদ ও সাকারবাদ

ফলত অবতারবাদ মাত্রেই সাকারবাদ। অবতীর্ণ হইতে গেলেই ঈশ্বরকে কোন না কোন আকার ধারণ করিতে হয়। আমাদের দেশে অবতার স্বীকার করিয়াও হয়ত কেহ বা নিরাকারবাদী থাকিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে অবতার অসংখ্য; যুগাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, আবেশাবতার ইত্যাদি বহুবিধ অবতারের উল্লেখ আছে, আবার পূর্ণ অবতারেরও উল্লেখ আছে। আর মায়াবাদের সাহায্যে কোনো ব্যক্তি অবতার দেহকে মায়িক বলিয়া, অবতারীর নিরাশয়ত্ব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে পারেন। আর এরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা যে আমাদের মধ্যে একেবারে হয় নাই, তাহাও নহে। কিন্তু খৃষ্টীয় অবতারবাদে—ইনকারণেষন—রক্তমাংসময় দেহ ধারণ বোঝায়। এখানে

গুণাবতার, আবেশাবতার প্রভৃতির স্থান নাই। এখানে Word made flesh—ঈশ্বরের যে বাক্য অনাদি আদি হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন যিনি স্বয়ং ঈশ্বর—God or very God—তাহাই রক্তমাংসে পরিণত বা প্রকাশিত হন। সুতরাং এখানে অবতারকে সাকার বলিতেই হয়। তবে যে আকারে যিশু ইহলোকে বিহার করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই তাঁর দেহ ছিল, না কেবল মাত্র ছায়াবাজির ছায়ার মত ছিল, —এ প্রশ্ন প্রাচী খৃষ্টমণ্ডলীর মধ্যেও উঠিয়াছিল। একদল লোকে যিশুর নরাকৃতি যে রক্তমাংস গঠিত ছিল, ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তাঁরা বলিতেন যে যিশুকে কেবল মানুষের মত দেখাইত মাত্র, বস্তুত তিনি মানব-দেহধারী ছিলেন না। আমাদের পরিভাষায় বলিতে গেলে, এই বলিতে হয় যে, ইঁহারা যিশুর মানব-দেহকে "মায়িক" বলিয়া স্বীকার করিতেন, "কায়িক" বলিয়া মানিতেন না। কিন্তু খৃষ্টীয় মণ্ডলী ইঁহাদিগকে "হেরিটিক্" বা অবিশ্বাসী বলিয়া বর্জ্জন করেন। তদবধি যিশু যে নরদেহে সত্য সত্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা সকল খৃষ্টীয়ান্ মণ্ডলীই একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আর যিশু ও ঈশ্বরেতে যখন বস্তুত ও তত্ত্বত, Ousia বা Essenceএ, কোনই পার্থক্য নাই, তখন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরাকার হইয়াও মানবাকার ধারণে যে তাহার মর্য্যাদাহানি হয় না, ইহা খৃষ্টীয়ান্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং খৃষ্ট-শিশুদিগকে কোনো ক্রমেই যথার্থ নিরাকারবাদী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ইস্‌লামের নিরাকারবাদ

বর্ত্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সকলের মধ্যে এক ইস্‌লামকেই অনেক পরিমাণে নিরাকারবাদী বলা যায়। "অনেক পরিমাণে" বলিতেছি এই হেতু যে, ইস্‌লামও দ্বৈততত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং দ্বৈতবাদে ঈশ্বর-

তত্ত্বে যে পরিচ্ছিন্নতা অপরিহার্য্যরূপে আরোপিত করে, তাহার দ্বারা ইস্‌লামের ঈশ্বরতত্ত্বেও একরূপ চিদাকার অরোপিত হইয়া থাকে; তথাপি ইস্‌লাম্ ঈশ্বরের অবতার বা বিগ্রহ এ সকল কিছুই স্বীকার করেন না। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে কিম্বা খৃষ্টীয়ধর্ম্মে যে আকারের সাকারবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইস্‌লামে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে ইস্‌লামে স্বর্গের যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরাকার-বাদ সম্বন্ধেও অনেকটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। মুসলমান সাধকদিগের জীবনচরিত পাঠে এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। কারণ, ইস্‌লামের ঈশ্বরতত্ত্ব একান্ত নিরাকার যদিই বা হয়, মুসলমান সাধনাতে সে নিরাকারত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই।

ইস্‌লামের গুরুবাদ

কারণ, ইস্‌লামে অবতারবাদ না থাকিলেও অতি পরিস্ফুট আকারে গুরুবাদ আছে। ইস্‌লাম অবতার অস্বীকার করিয়াও নবী বা প্রবক্তা স্বীকার করেন। ইঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয়, ঈশ্বরের আদেশ প্রচার করিয়া লোকমণ্ডলীকে ধর্ম্মপথে লইয়া যান। রসুলকে ছাড়িয়া কোনো মুসলমান খোদার দরজায় পৌঁছিতে পারেন না। সুতরাং হজরত্ মোহাম্মদ মুসলমান সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। গভীর যোগে ও সমাধিতে মুসলমান সাধকদিগের সমক্ষে হজরত্ মোহাম্মদ বা আলী প্রভৃতি তাঁহার আসন্ন পরিচারক ও শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যে সাধক এইরূপে ধ্যানযোগে আল্লার, রসুলের বা তাঁহার অনুচরগণের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, ইস্‌লাম তাঁহাকে অতি উচ্চ অধিকারী বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং তত্ত্বাঙ্গে একরূপ নিরাকার হইয়াও, সাধনাবলে, এই গুরুবাদ নিবন্ধন, ইস্‌লাম যে সাকার-আশ্রয় লইয়া থাকেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

সাকারোপাসনা—পরদেবোপাসনা

অতএব, জগতে প্রাচীনকাল হইতে যে সকল ধর্ম্ম লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার আলোচনাতে দেখি যে, এক ভারতবর্ষে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের দ্বারাই কেবল যথার্থ নিরাকারতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আর সকল ধর্ম্মেই কোথাও বা তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে উভয়ত, কোথাও বা অন্তত সাধনাঙ্গে, কোনো না কোনো আকারে সাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহুদী, খৃষ্টীয়ান বা ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে আপাতত সাকারোপাসনার তীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অর্থ একান্তভাবে সাকারোপাসনা বর্জ্জন করা নহে, কিন্তু পর-দেবোপাসনা মাত্রকে বিগর্হিত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা। ইহুদায় মূর্ত্তিপূজা পাপ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ইহুদীয় এই আদেশের বশেই খৃষ্টীয়ান মণ্ডলী-মধ্যেও সাকারোপাসনা বর্জ্জিত হইয়াছে। ইস্‌লামও এই দশাজ্ঞাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানেন, এবং ইস্‌লামে সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায়, তাহাও মূলে ইহুদা ধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হইয়াছে। মোহাম্মদের সময়ে আরবে নানা প্রকারের দেব-দেবীর ভজনা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। এই সকল দেবোপাসনার সঙ্গে প্রথম হইতেই ইস্‌লামের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দিতা দাঁড়াইয়া যায়। ক্রমে এই দেবোপাসকদিগের সঙ্গে মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের মারাত্মক বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং ইহাদের হাতে প্রথমে হজরত্ ও তাঁহার ভক্তগণ নিরতিশয় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন। এই কারণে, বোধ্-পরস্তদের প্রতি স্বভাবতঃই ইস্‌লামের একটা গভীর বিদ্বেষ জন্মিয়া যায়। আপনার মণ্ডলীর পবিত্রতা, অর্থাৎ পার্থক্য, রাখিবার জন্য মোহাম্মদকে অতি তীব্রভাবে এই সাকারাবাদের নিন্দা করিতে হয়। সুতরাং মূলত ইহুদীয়, খৃষ্টীয় বা মোহাম্মদীয় ধর্ম্মে যে সাকারাবাদ বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিরাকারবাদ

প্রতিষ্ঠা করা নহে, কিন্তু ঐকান্তিকভাবে পরদেবোপাসনার মাত্র প্রতিরোধ করা। যে প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতে, আর্য্যসমাজে অনার্য্য মিশ্রণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক তদনুরূপ প্রয়োজনে, ইহুদীয় ও পরে খৃষ্টীয় ও মোহাম্মদীয় ধর্ম্মে সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে এরূপ কঠোর নিষেধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচ্ছন্ন সাকারবাদ

ফলত প্রকৃত নিরাকারবাদী সাকারোপাসনাকে মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া বর্জ্জন করিলেও, পাপ বলিয়া কখনো ঘৃণা করিতে পারেন না। সাকারোপাসনায় ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা বাস্তবিক একান্ত নিরাকারবাদী নহেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার আছে, ইহা ধরিয়া লন। যাঁর কোনো নিজস্ব আকার আছে, অন্য আকারে উপস্থিত করিলেই তাঁহার গৌরবহানির সম্ভবনা আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁর নিজস্ব কোনো আকার নাই, যে বস্তু একান্ত নিরাকার, তাহাতে কোন ভক্তিযোগ্য আকার আরোপ করিলে তাঁহার অবমাননা হইবে কেন? সুতরাং সাকারোপাসনাকে যাঁরা পাপ বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলেন, তাঁহাদিগকে প্রচ্ছন্ন সাকারবাদী ভিন্ন আর কিছ বা বলা যাইতে পারে! ভারতের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রকৃত নিরাকারবাদী; সুতরাং তাঁহারা সাকারোপাসনাকে অসৎ বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, কখনো অপরাধ বলিয়া নিষেধ করেন না। হিন্দু বৈদান্তিকেরা নিরাকারের উপাসক হইয়াও খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের ন্যায় কেন যে এ দেশে প্রচলিত প্রতিমা-পূজার কোনো বিশেষ প্রতিবাদ করেন না,—তাঁহাদের বিশুদ্ধ নিরাকারবাদই ইহার প্রধান কারণ।

অবিদ্যাবদ্বিষয়ানি

ইহাদের চক্ষে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব যা কিছু সাধন ভজন করুক না কেন, সকলই পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, সকলই অবিদ্যাবদ্বিষয়ানি। বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—এ সকলই মায়াধীন, মায়াভিভূত। জীব যতক্ষণ না এ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, ততক্ষণ তাহার আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। ততক্ষণ সে যে কোনো প্রকারের উপাসনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তৎসমুদায়ই মায়িক, মিথ্যা, কল্পিত। সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সমাধিতে সকল ইন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া যায়। সে অবস্থায় দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করেন; আর তখন কঃ কেন পশ্যেৎ—কে কাহার দ্বারা কা'কে দেখে, কে কিসের দ্বারা কা'কে শোনে—সকলই ব্রহ্মাত্মৈকত্বে একীভূত হইয়া কেবল আনন্দঘন মাত্র অনুভূত হয়। তখন উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধও লুপ্ত হয়। এইজন্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তে উপাসনামাত্রেই ভেদাত্মক বলিয়া, মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও, নিষ্ফল নহে। কারণ ইহার দ্বারাই ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সাধক অদ্বৈততত্ত্বে প্রবেশ করেন। নিম্ন অধিকারীর জন্য উপাসনাদি নিত্য কর্ম্মরূপে বিহিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরূপোপাসনা, সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা

আর এই নিম্ন অধিকারেও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ আছে। ফলতঃ বেদান্তে তিনপ্রকার উপাসনার বিধান আছে। স্বরূপোপাসনা, সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। স্বরূপোপাসনা—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ; ইহাকে প্রকৃতপক্ষে উপাসনা বলা যায় না; কারণ স্বরূপোপলব্ধিতে উপাস্য-উপাসক

ভেদ থাকে না। স্বরূপোপাসনায় যতক্ষণ অধিকার না জন্মে, ততক্ষণ সম্পদুপাসনা বা প্রতীকোপাসনা বিহিত হয়। ইহার মধ্যে সম্পদুপাসক মধ্যম অধিকারী, প্রতীকোপাসক নিকৃষ্ট অধিকারী।

সম্পদুপাসনা

দুই বস্তুর মধ্যে কোন সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া, ক্ষুদ্রতরের সাহায্যে বৃহত্তরের যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সম্পদজ্ঞান। ভূগোল শিখিবার কালে ক্ষুদ্র কমলালেবুর সাহায্যে বৃহৎ ও অপরিমেয়প্রায় যে এই পৃথিবী তাহার আকারের জ্ঞান সাধিত হয়, এ জ্ঞান সম্পদজ্ঞান। দৃষ্ট ও পরিমিত কমলালেবুর সঙ্গে অদৃষ্ট ও প্রায় অপরিমিত পৃথিবীর আকার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ভূগোলে পৃথিবী কমলালেবুর মত গোলাকার এই উপদেশ দিয়া পৃথিবীর আকারের জ্ঞান জন্মায়। পৃথিবী যদি উপাস্য হইতেন, তবে কমলালেবু অবলম্বনে তাঁহার যে উপাসনা হইত, তাহাকে সম্পদুপাসনা বলা যাইতে পারিত।

প্রাণোপাসনা

প্রাণোপাসনা ও সূর্য্যোপাসনা উভয়ই সম্পদুপাসনা। নিরাকারবাদীও প্রাণরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে স্বরূপোপাসনা বলিয়াই গণনা করেন। ফলতঃ প্রাণতত্ত্বে ও পরাতত্ত্বে ও ব্রহ্মতত্ত্বে, প্রভেদ বিস্তর। উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে —'যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি প্রাণ-স্বরূপ।' কিন্তু এখানে প্রাণ বলিতে বিশ্বপ্রাণ বোঝায়। জীবে যাহা ধর্ম্মভাবে প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু যে নিত্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া এ সকল প্রাণ স্থিতি করিতেছে তাহাকেই এখানে প্রাণ বলা হইয়াছে। এ প্রাণ অদ্বৈত বস্তু। আমার, তোমার, তাহার—এবম্বিধ উপাধি এ প্রাণে

আরোপিত হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মরূপে আপনার বিশিষ্ট প্রাণের ধ্যান করেন, তাঁহাদের প্রাণাত্মবুদ্ধি নষ্ট হয় নাই। আর এই প্রাণাত্মবুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, অবিদ্যান্তর্গত। প্রাণময় কোষ, কোষপঞ্চকের দ্বিতীয় কোষ। বেদান্ত বলেন যে, পঞ্চকোষ ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে জীব কখনো পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং প্রাণোপাসনা স্বরূপ উপাসনার অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হয় না। প্রাণোপাসনা সম্পদুপাসনা। প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্মের সামান্য ধর্ম্ম আছে। ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ, প্রাণ চৈতন্যরূপী। প্রাণের মধ্যে প্রাণরূপে, প্রাণাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে, প্রাণের এই চৈতন্যধর্ম্মকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে। প্রাণ যেমন চৈতন্যরূপী, তেমনি জড়দেহেও আবদ্ধ, জড়ের দোষগুণের দ্বারা সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর অভিভূত হয়। আবার প্রাণ গমনাগমনশীল, প্রকাশপ্রকাশাধীন। প্রাণের সংসার আছে, সংস্থিতি আছে। এ সকল ব্রহ্মে নাই। সুতরাং সমগ্র প্রাণকে,—তার জড়সংশ্লিষ্টতা, গতাগতি, জন্মমৃত্যুজরাভিভূতি প্রভৃতি বর্জ্জন না করিয়া,—উপাসনা, এবং তাহার ধ্যান ধারণার চেষ্টা করিলে, তাহা সম্পদুপাসনা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। মূল উপাস্যের সঙ্গে সম্পদের যে সামান্য ধর্ম্ম, তাহাই সম্পদুপাসনার প্রাণ; যখনই ধ্যান এই সামান্য ধর্ম্মের অতিক্রম করে তখনই ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

সূর্য্যোপাসনা

প্রাণোপাসনার ন্যায় সূর্য্যোপাসনাও বেদান্তে সম্পদুপাসনা বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানেও ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের যে সামান্যধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কেবল সূর্য্যের উপাসনা করিলে, তাহা সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও জগৎ-প্রকাশক; ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে

প্রকাশিত করিয়াছেন ও প্রতিনিয়তই প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মচৈতন্যের মূল লক্ষণ। এই অর্থেই ব্রহ্ম জ্ঞান-সূর্য্য। আর এই-খানেই ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের সামান্যধর্ম্ম লক্ষিত হয়। কারণ সূর্য্যও স্বয়ং-প্রকাশ, অপর কিছু সূর্য্যকে প্রকাশিত করে না—করিতে পারে না; অথচ সূর্য্য, অপর যাহা কিছু দৃষ্ট বস্তু, তৎসমুদায়কে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। সূর্য্যের এই স্বয়ং-প্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশকত্ব ধর্ম্মকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া যে সূর্য্যোপাসনা হয়, তাহাই সম্পদুপাসনা। তদ্দ্বারা ব্রহ্মধ্যানের সহায়তা হয়। তাহাই ব্রহ্মোপাসনার সোপানরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

সম্পদুপাসনা ও নিরাকারবাদ

নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্মবস্তুকে যখন মূল উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া সেই উপাসনার নিম্নতর সোপানরূপে সম্পদুপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ইহার দ্বারা যে নিরাকারবাদের বা অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনার মর্য্যাদা-হানি হয়, এমন বলা যায় না। ফলতঃ প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে খৃষ্টীয়ান, মোহাম্মদীয়ন প্রভৃতি নিরাকারোপাসকাভিমানী ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে যেরূপ উপাসনা প্রচলিত আছে, তাহাও স্বরূপ-উপাসনা বলিয়া গৃহীত হইবে না। খৃষ্টীয়ানেরা ঈশ্বরকে পিতা ও প্রভুরূপে ভজনা করেন। মুসলমান সাধকেরাও তাঁহাকে রাজা ও প্রভু এবং কখনো কখনো সখারূপেও ভজনা করিয়া থাকেন। আর সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ঈশ্বরে পিতৃত্ব, প্রভুত্ব, বা স্বামিত্ব আরোপ করাও সম্পদজ্ঞানেরই লক্ষণ। আধুনিক নিরাকারবাদের আলোচনায় সবিস্তারে এ বিষয়ের বিচার করিব।

প্রতীকোপাসনা ও সাকারবাদ

প্রতীকোপাসনাই অতি স্থূলভাবে সাকারোপাসনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কাষ্ঠলোষ্ট্রের উপাসনা প্রতীকোপাসনার অন্তর্গত। দেশ-প্রচলিত প্রতিমা-পূজাকে ঠিক প্রতীকোপাসনা বলা যায় কি না, সন্দেহের কথা। কারণ, মূর্ত্তিমাত্রেই যদিও প্রতীক তথাপি ভগবদ্‌স্বরূপের কোনো না কোনো ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিমাদির স্বল্পবিস্তর সামান্যধর্ম্ম প্রকাশেরও চেষ্টা হইয়া থাকে। প্রতিমাপূজাতে এইজন্য সম্পদ ও প্রতীকের মাঝামাঝি একটা ভাব আছে। ইহাকে প্রতীকাশ্রিত সম্পদুপাসনা বলা যাইতে পারে। যাহা হোক, প্রতীকোপাসনাকে বেদান্তে অধ্যাসজনিত উপাসনা বলে। অধ্যাস অর্থ—পরত্রদৃষ্ট অন্যত্রাবভাসঃ—অন্যত্রদৃষ্ট কোন বস্তুকে যেস্থানে তাহা প্রকৃতপক্ষে নাই, সেখানে আরোপ করার নাম অধ্যাস। কোনোকালে বনে যে সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল, গৃহস্থিত রজ্জুতে সেই সর্পের অস্তিত্ব আরোপ করাকে অধ্যাস বলে। ইহা অধ্যাসের ধর্ম্ম। প্রতীকোপাসনা অধ্যাসজনিত উপাসনা; ইহার অর্থ এই যে, শাস্ত্রে শ্রুত, গুরু-উপদেশ প্রাপ্ত, অথবা আপনার বুদ্ধিতে প্রকাশিত, বা আত্মাতে আভাস রূপে অনুভূত যে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকে, যে বস্তুতে তাহার স্বতঃ প্রকাশ নাই, তাহাতে আরোপ করিয়া, ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে সে বস্তুর পূজা করাই প্রতীকোপাসনা। এখানেও সুতরাং সাধক একেবারে নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞানবর্জ্জিত নহেন। উপাসনার অবলম্বন সাকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, উপাস্য যিনি, তিনি নিরাকার অতীন্দ্রিয়; প্রতীকোপাসনায়ও জ্ঞানের অভাব বা বিলোপ হয় না। সুতরাং প্রতীকোপাসনাকেও প্রকৃতপক্ষে সাকারবাদ বলা যায় না; তবে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার, বেদান্ত স্বয়ংই এ কথা স্বীকার করেন।

আধুনিক নিরাকারবাদ

আমাদের আধুনিক নিরাকারবাদও মোটামুটি সম্পদ্ সোপান পর্য্যন্তই উঠিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রবন্ধান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় চিন্তা

প্রথম অধ্যায়

প্রাণের কথা

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মানুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।

সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণংব্রহ্মোপাসতে।*

শুনিয়াছি, বয়স হইলে, লোকের প্রাণের মায়া কমিয়া আসে। যার কমে না, সে অধম, ঘোর সংসারী। বয়সের সঙ্গে আমার কিন্তু প্রাণের মমতা কমে নাই, বরং বাড়িয়াই বুঝি চলিয়াছে। এ জন্য আমাকে অধম বলিতে হয়, বল। অধম যে নই, স্পর্দ্ধা করিয়া এমন কথাও বলিতে পারি না। তোমরা অধম আমায় বলিলে, গায়ে বড় লাগে সত্য, যেন তপ্ত তৈলের ছিটা পড়ে, মন প্রাণ তাতে চিড়বিড় করিয়া উঠে। তোমরা আমার আপনার জন নও, তাতেই বুঝি অমন হয়। আবার অধম বলিয়া তোমাদের আনন্দ হয়, তোমাদের অভিমান পুষ্ট হয়, তাই তাতে আমার অভিমানে এমন আঘাত লাগে। কিন্তু আমি নিজেকে অধম বলিয়া জানি বা না জানি, অনেক সময় ভাবিয়া থাকি। আমার নিজের মুখে যখন আমি নিজেকে অধম বলি, তখন প্রাণে আরাম পাই। নিজেকে নিজে নীচু করার একটা মহত্ব আছে, তারই জন্য আপনাকে অধম বলিয়া মানাতে আমি কুণ্ঠিত নহি। অধম যে নই,—এমন কথা তাই বলিতে চাহি না। কিন্তু প্রাণকে ভালবাসি এই জন্য আমি অধম, এ কথা তোমরা

*তৈত্তিরীয়োপনিষত্, ব্রহ্মানন্দবল্লী।

বলিলেও আমি শুনিব না। বয়স ফুরাইয়া আসিল, কিন্তু প্রাণের মায়া কমিল না, এজন্য আমি একরত্তিও লজ্জিত নই; প্রাণের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হইবে—ভাবিতে অসহ্য যাতনা হয়, একথা স্বীকার করিতে আমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি। প্রাণ আমার অতি প্রিয়, এ প্রাণের চাইতে প্রিয়তর এ জগতে আর কিছুই নাই। এই প্রাণ আমার প্রীতির মাপ-কাঠি। যা'কে নিরতিশয় প্রীতি করি তা'কে প্রাণতুল্য বলিয়া সম্বোধন করি। যার চাইতে জগতে আর কিছু প্রিয়তর আছে বলিয়া মনে হয় না, তাকে প্রাণ বলিতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এ জগতে যা কিছু প্রিয়, তা কেবল এই প্রাণের জন্য। এই প্রাণের সেবা করিয়া তারা সকলে প্রিয় হইয়াছে! স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, সমাজ, স্বদেশ, দেব, মানব সকলে প্রিয় এই প্রাণের জন্য। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত এই প্রাণের সেবা করিয়া এত প্রিয় হইয়াছে। এমন যে প্রিয় প্রাণ, ইহাকে ছাড়িব ভাবিলে কষ্ট হয়, এ আর বিচিত্র কি?

এ প্রাণকে বড় ভালবাসি; কিন্তু তাকে ভালরূপ করিয়া এখনো চিনি না। ভাল করিয়া যদি জানিতেই পারিতাম, তবে বুঝিবা এ প্রেমও থাকিত না। জানি অথচ জানি না, যত জানি তত জানি না, যত নিকটে আনি ততই যেন আরো দূরে সরিয়া যায়; এই যে আলো-আঁধারের বিচিত্র লীলা, তাহাতেই প্রেম জন্মে, তাতেই প্রেম বাঁচে ও বাড়ে। যাকে ভালবাসি সে চিরকাল আমার চাইতে বড় থাকিবে। যাকে একেবারে জানিয়া ফেলিলাম, সে ত মুঠোর ভিতরে আসিয়া পড়িল। সে তো ছোট হইয়া গেল। তার প্রতি প্রেম আর তেমন ভাবে, তেমন জ্বলন্ত পিপাসা বুকে লইয়া ছুটিয়া যায় না। আর ঐ পিপাসাই প্রেমের প্রাণ।

জানি, জানি, মনে জানি; কিন্তু আমি জানিনে
চিনি, চিনি, মনে চিনি; কিন্তু আমি চিনিনে।

ইহাই প্রেমের উপজীব্য। প্রাণকে আমি জানি না, তাই এত ভালবাসি। যদি এ জনমে প্রাণকে ভাল করিয়া একবার জানিয়া ফেলিতে পারিতাম, তবে তার মায়া আপনি হয়ত কাটিয়া যাইত। বয়সের সঙ্গে যাদের প্রাণের মায়া সত্য সত্যই কাটিয়া যায় বুঝিবা তারা প্রাণকে ভাল করিয়া জানিয়া ফেলে। আর জানুক বা না জানুক, যতটা সম্ভব—একেবারে তারা শেষটা দেখিয়াছে, অন্ততঃ এ অভিমান তাদের জন্মে। নইলে প্রাণের মায়া ছুটে কিসে? তারা এই দেহকেই প্রাণ বলিয়া ধরিয়া লয়, এ সকল ইন্দ্রিয়কেই প্রাণ বলিয়া গণনা করে, তাই দেহ যত দুর্ব্বল হয়, ইন্দ্রিয় যত বিকল হয়, ততই প্রাণও শেষ হইয়া আসিতেছে ভাবিয়া, তা'র প্রতি মমতাশূন্য হইয়া পড়ে। তারা যন্ত্রকে যন্ত্রী বলিয়া ধরে, আধারকে আধেয় বলিয়া ভাবে। যন্ত্রকে জানিয়াই যন্ত্রীকেও জানিয়া ফেলিয়াছে, তাঁর দৌড় কত তাহা দেখিয়াছে, মনে করে। তাই তাদের প্রাণের মায়া কমিয়া যায়। কিন্তু আমি এখনো প্রাণকে চিনিলাম না। প্রাণের স্বরূপ এখনো বুঝিলাম না, এ প্রাণের ভিতরে কত কি যে আছে না আছে, তার কিছুরই সন্ধান এখনো পাইলাম না। এ জন্ম বুঝি এই ভাবেই যাবে। কত জন্ম যে এইভাবে যাবে তাহারই বা ঠিকানা কোথায়? বয়স বাড়িল, আয়ু ফুরাইতে চলিল, কিন্তু এ প্রাণকে জানা হইল না, তাই ইহাকে এত ভালবাসি। এ প্রাণের উৎপত্তি কোথায়, ইহার স্থিতি কিসে, ইহার গতি ও পরিণাম কি,—এ সকল কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। খুঁজিতে গেলে, আপনাকে অনন্ত অসীমে হারাইয়া ফেলি। এ জনমে এতটুকু মাত্র মনে হয়, যেন বুঝিয়াছি যে এই প্রাণ হেয় বস্তু নহে। ইহা ক্ষুদ্র নহে। ইহার মধ্যে যেন এই বিশাল বিশ্ব লুকাইয়া আছে। জানিয়াছি শুধু এই যে, এ প্রাণ নিত্য বস্তু, শাশ্বত সনাতন। ঊর্দ্ধমূলোঽবাকশাখঃ এষোঽশ্বত্থ সনাতন,—মনে হয় এই প্রাণই সেই

শ্রুতিকথিত সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ যাহার মূল উর্দ্ধে অনন্ত দেবপিতৃলোকে, আর যাহার শাখা প্রশাখা নিম্নে এই নরলোকে অনন্তভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই প্রাণের উৎপত্তি কোথায় জানি না, জানি কেবল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, দুই পবিত্র কুলধারা এই প্রাণেতে গঙ্গা যমুনার মত সম্মিলিত হইয়া ইহাকে পরম পবিত্র প্রয়াগ তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে আমি আজন্মকাল এই পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছি। পিতাতে মাতাতে, দুই দুই প্রাণধারা মিলিত হইয়া তাঁহাদের প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছিল। অথবা তাই কেন বলি, তাঁদের মিলনে দুই নহে, চারি, চারি নহে, আট; আট নহে, ষোড়শ; ষোড়শ নহে, বত্রিশ; বত্রিশ নহে, চৌষট্টি; চৌষট্টি নহে শতাধিক, সহস্রাধিক,—কত কুলধারা, কত প্রাণধারা যে এক একটি প্রাণেতে আসিয়া মিলিত হয়, তার সংখ্যা করে কে? এই প্রাণ ধরিয়া যখন উচ্চে বহিয়া চলি,—অল্পক্ষণ মধ্যে এক অসংখ্যশাখ, অনাদ্যনন্ত প্রাণস্রোতে গিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। তখন দেখি এই প্রাণই পবিত্র সুরধুনী, সকল প্রাণের প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপাদপদ্মে—এই প্রাণধারার উৎপত্তি। এই প্রাণের দিকে যখনই তাকাই তখন উদার-চরিত না হইয়াও, সমগ্র বসুধাকে কটুম্ব বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সাধ যায়। কত শত কত সহস্র কত লক্ষ, কত কোটী কোটী প্রাণধারা মিলিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রাণের সৃষ্টি করে, তার গণনা করিবে কে? শত শত মন্বন্তর ব্যাপী প্রাণন চেষ্টার শেষ ফল রূপে এই ক্ষুদ্র প্রাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহার মর্য্যাদার সীমা কোথায়? কত যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া, কত দেব, কত মানব, কত দেবর্ষি, কত রাজর্ষি, কত মহর্ষি, কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী, কত যোগী, কত ভক্ত, কত আশা ভরে, কত যত্নে, কত আদরে, কত ভাবে, এই প্রাণের পরিচর্য্যা করিয়া, কত শিক্ষা দীক্ষা দিয়া, আপনাদের আজন্ম সাধিত, সাধনসম্পত্তি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, ইদানীং এই সংসারে, এক ক্ষুদ্র

পরিবারে, এক নরদম্পতির পরম পবিত্র প্রাণযাগের যজ্ঞফলরূপে, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে ফুটাইয়াছেন,—ইহা যখন মনে হয়. তখন, সত্য বলি, এ প্রাণকে আর আমার বলিতে সাহস হয় না। এ যে বিশ্বপ্রাণ—এ যে হিরণ্যগর্ভ ; এ যে প্রজাপতি ; পবিত্র পুরুষযজ্ঞে ইহার উৎপত্তি। যে যজ্ঞের দেবতা কাম, ছন্দ বেদমাতা গায়ত্রী, ঋষি বিশ্বস্য মিত্রং—বিশ্বামিত্র ; পুরুষ প্রেমস্নাত হইয়া যে যজ্ঞের অগ্নিতে আপনাকে আপনি শ্রদ্ধা সহকারে, আহুতিরূপে অর্পণ করেন, সেই মহাযজ্ঞ হইতে এই প্রাণের উৎপত্তি। এ প্রাণের মহত্ত্বের শেষ কোথায় ? এমন প্রাণকে ভলেবাসি, ইহার জন্য লজ্জিত হইব কেন ?

এই বিশাল বিশ্ব এই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবতা, অনাদি কাল হইতে প্রাণের দ্বারস্থ হইয়া, ইহার নিকটে, নিয়ত আপনার জীবনের সম্যক সফলতা ভিক্ষা করিতেছেন। যে রূপ-তন্মাত্রা জ্যোতির্ম্ময় সবিতার প্রাণস্বরূপ, তাহা আপনার সার্থকতার জন্য এই প্রাণমুখাপেক্ষী চক্ষু দুটীর মুখ চাহিয়া আছে। চক্ষুর জন্য রূপের সৃষ্টি, না রূপের জন্য চক্ষুর সৃষ্টি—কে বলিবে ? তেজ আগে না চোখ আগে—কে জানে ? কিন্তু প্রাণের আশ্রয় করিয়া প্রাণের মধ্যে যে ইহারা পরস্পরের সফলতা সম্পাদন করে, এ তো প্রত্যক্ষ কথা,—ইহা অস্বীকার করিব কেমনে। যে শব্দতন্মাত্রা প্রাচীন ঋষিকুলপুঞ্জে আকাশ-দেবতার প্রাণ, তাহা আপনার সফলতার জন্য শ্রুতিযুগলের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। যে স্পর্শতন্মাত্রা বায়ুদেবতার প্রাণ তাহা সেইরূপ আপনাকে চরিতার্থ করিবার প্রত্যাশায় ত্বকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। যে রসতন্মাত্রা জল-দেবতা বারুণীর প্রাণ, তাহা আপনার সফলতার জন্য এই প্রাণমিশ্রিত রসনার প্রতি চাহিয়া থাকে। যে গন্ধতন্মাত্রা এই ধরিত্রী পৃথিবী-দেবতার প্রাণ, তাহা এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে আপনার সফলতা লাভ করিয়া থাকে। পঞ্চতন্মত্রাত্মক এই পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চভূতাত্মক. এই

বিশাল জগতপ্রপঞ্চ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের, এবং এই পঞ্চেন্দ্রিয়, আপন সফলতা লাভের জন্য এই প্রাণের শরণাগত হইয়াছে। এবং এই প্রাণই বিশ্বম্ভর,—বিশ্বকে ভরণপোষণ করিতেছে। সৃষ্টি-লীলায় এই প্রাণই মহাবিষ্ণু ; ব্যষ্টিভাবে, এই প্রাণই ক্ষিরোদশায়ী, জীবান্তর্যামী ; সমষ্টিভাবে, এই প্রাণই নারায়ণ বা বিশ্বমানব। এই প্রাণই ভগবানের পরা প্রকৃতি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কারং ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেঽপরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—আমার এই বিভিন্ন অষ্ট প্রকারের প্রকৃতি। এ সকল আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি, আমার অন্য এক শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে,—যে জীবপ্রকৃতি, যাহা দ্বারা, হে মহাবাহো! আমি এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

এই প্রাণই, এই পরা জীবপ্রকৃতি। এ প্রাণের দ্বারাই ভগবান সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টিলীলায় এই প্রাণই লীলা-ময়ের প্রধান সহায়। এমন যে বস্তু, এমন যে মহান্, এমন যে পবিত্র পরম তত্ত্ব, তাহাকে ভালবাসি, ইহাতে লজ্জার কথা কি আছে?

তোমরা তা জান না। সংসারের লোকে সে খবর রাখে নি। কিন্তু যে দিন এই ক্ষুদ্র প্রাণ ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সাড়া পড়িয়াছিল। দেবলোক, পিতৃলোক সিদ্ধলোক, গন্ধর্ব্বলোক, নরলোক, সুরলোক, যক্ষরক্ষ-অসুর-লোক,—সকল লোকে সে দিন সাড়া পড়িয়াছিল। বালকেরা নদীতীরে দাড়াইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নদীগর্ভে উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, নদীজলের তরঙ্গভঙ্গ দেখিয়া আমোদ করে,— তারা জানে না যে এই এক একটী সামান্য তরঙ্গে বিশাল সাগরবক্ষ পর্য্যন্ত অদৃশ্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শিশুরা সাবান জলে ফুঁ দিয়া আকাশে বুদ্‌বুদ উড়াইয়া, তার গায়ে ইন্দ্রধনুর রং ফুটাইয়া করতালি

দিয়া নৃত্য করে; তারা জানে না যে এই এক একটী বুদ্‌বুদ যখন ফাটিয়া আকাশে মিলিয়া যায়, তখন নিখিল বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইয়া উঠে। তেমনি আমরাও জানি না যে, এক একটী ক্ষুদ্র মানব শিশুর প্রথম নিঃশ্বাস যখন এই পৃথিবীতে পড়ে, তখন নিখিল বিশ্বে রোমাঞ্চ উঠিয়া থাকে, এই ক্ষুদ্র জীবের সামান্য নিঃশ্বাসের সঙ্গে কত স্নেহ, কত প্রেম, কত আনন্দ, কত বিষাদ, কত আশা, কত আশঙ্কা—যে বিশাল বিশ্বপ্রাণে শিহরিয়া উঠে, তার খবর কে রাখে? তার ওজন জানে কে? বুভুক্ষিত দেবতারা, তৃষিত পিতৃলোকেরা আসিয়া তখন ইহার সুতিকাগারকে জনাকীর্ণ করিয়া তোলেন। মা, তুমি জান না যে তোমার শয্যাতল তখন সকল তীর্থের সারতীর্থ হইয়া দাঁড়ায়।

তোমরা এই ক্ষুদ্র নবজাত প্রাণকে একরত্তি মানুষ, এক মুঠো মাংসপিণ্ড দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে পার। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ দেবতারা জানেন, এই একরত্তি জীব, এই এক মুঠো রক্ত মাংস বস্তু কি? তাঁরা জানেন এই এক বিন্দু প্রাণ, আজ বিশাল বিশ্বের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মফলের বোঝা মাথায় করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছে।

একঃ প্রজায়তে লোকঃ একোহনুভুঙক্তে সুকৃতমেক এবচ দুষ্কৃতং।

জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করে—কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু সে একাকী হইলেও, অগণ্য জীবের কর্ম্মফলের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মিয়া থাকে। এই তো তার মহত্ব, একাকী জন্মিয়া সে বহুজীবের, বহুযুগের সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। খৃষ্টীয়ানেরা বলেন, বিশ্বপিতা পরমেশ্বর পাপী জগতের পরিত্রাণের জন্য, আপনার একমাত্র পুত্রকে বলিদান করিয়াছেন। অজ্ঞলোকে ভাবে, জগতের ইতিহাসে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, জুদিয়াভূমে, ক্যাল্‌ভেরী ক্ষেত্রে, একবার মাত্র এই পবিত্র প্রায়শ্চিত্তের এই মহান পুরুষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু ভক্ত জ্ঞানীরা জানেন যে এ প্রায়শ্চিত্ত,

কেবল একবার মাত্র হয় নাই। জগতের আদি হইতে, পুরুষ পরম্পরায় এই পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত, এই মহান পুরুষ-যজ্ঞ সকল দেশে সকল সমাজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক জীবের জীবন আবরণ, এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। প্রত্যেক প্রাণী সমুদায় বিশ্বের কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই প্রায়শ্চিত্তের সাধন করে। প্রাণী-মাত্রেই, জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, এ সংসারে জন্ম লইয়া থাকে। কারো ভাগ্যে এ কার্য্যসমাধা হয়, কারো ভাগ্যে বা হয় না, কিন্তু সকলেই এই মহাযজ্ঞের স্বধা রূপে বিশাল বিশ্বের নিখিল কর্ম্মকুণ্ডে, বিশ্বপিতা বিধাতাপুরুষ কর্ত্তৃক, আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। কবে কোন্ ঐতিহাসিক যুগে, কোন্ অজ্ঞাত কারণে, মাতা বসুন্ধরা একবার বিক্ষুব্ধ হইয়া, কোথায় কি বিষরাশি উদ্গিরণ করিয়া-ছিলেন, তারই জন্য পৃথিবীর সে সকল ভূভাগ আজি পর্য্যন্ত বিষধর বীজাণুপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল ভূভাগে যেই জন্মা'ক না কেন, সেই যে বসুধার এই প্রাচীনকৃত কর্ম্মবোঝা মাথায় লইয়া আসে, এবং আমরণ এই প্রাণনাশী জীবাণুপুঞ্জের সঙ্গে যুঝিয়া সেই প্রাচীন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করে,—ইহা কি সত্য নহে? কেন যে মাঝে মাঝে সূর্য্য দেহে স্ফোটক প্রকাশিত হয়, পণ্ডিতেরা এখনো ইহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু এই সকল সৌর-স্ফোটকে বা sunspot এ পৃথিবীর আবহাওয়ার যে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে একথা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সৌরস্ফোটক নিবন্ধন বায়ুমণ্ডলের স্বভাব বিপর্য্যয় যখন ঘটে, তখন যে প্রাণীই সে বায়ুমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সবিতার এই কর্ম্মফলের বোঝা সল্পবিস্তর পরিমাণে তাহাকে বহিতেই হয়। মাটির দোষগুণ যে কেবল উদ্ভিদেই ফুটিয়া উঠে, তাহা নহে;—প্রাণীকেও পূর্ণমাত্রায় তাহার ভাগী হইতে হয়। জলের দোষগুণ, বায়ুর দোষগুণ,—পঞ্চমহাভূতের সমুদায় সুকৃত দুষ্কৃতের

ভার এ জগতে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে, আপন আপন প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকেই বহন করিতে হইতেছে। আর পুর্ব্বপুরুষের দোষগুণের ভার যে সকল মানুষকেই বহিতে হয়, এ তো প্রত্যক্ষ কথা। পিতার কর্ম্মবোঝা মাথায় লইয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একরত্তি শিশুও তার সামান্য ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মিলে, যে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিক্ষেপে প্রাণহানির আশঙ্কা পর্য্যন্ত জাগাইয়া তোলে,—এ কি কেবল তার নিজের কর্ম্মের ফলে, না,—পিতার ক্রোধ, মাতার অপস্মার, পিতামহের পারুষ্য, মাতামহের মাৎসর্য্য, এইরূপ পুরুষপরম্পরাগত সঞ্চিত কর্ম্মের পরিণাম? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একথা সত্য, কিন্তু সে কেবল আপনার কর্ম্মবোঝা মাথায় লইয়া কর্ম্মটুকু মাত্র ক্ষয় করিতে এ সংসারে আসে, ইহা সত্য নহে। এই বাংলা দেশে জন্মিয়া, এই মাটীর দোষগুণের বোঝা কি সকল বাঙ্গালীকে বহিতে হইতেছে না? মাটীর গুণে, জলের গুণে, হাওয়ার গুণে, বঙ্গবাসী বাঙ্গালী হইয়াছে, শিখ শিখ হইয়াছে, রাজপুত রাজপুত হইয়াছে, গুজরাটী গুজরাটী হইয়াছে, মারাঠা মারাঠা হইয়াছে,—তামিল, তৈলঙ্গী সকলেই আপনার দেহে আপন আপন মাটীর দোষগুণের বোঝা বহিতেছে; কেহ বা দীর্ঘাকৃতি কেহ বা খর্ব্বকায়, কেহ বা বলিষ্ঠ কেহ বা দুর্ব্বল, কেহ বা কর্ম্মঠ কেহ বা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে,—ইহা কি সত্য নহে? মানুষ কেবল নিজের সুকৃত দুষ্কৃতের বোঝা লইয়াই এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে, এই যদি সত্য হয়, তবে সংসারের সকল সম্বন্ধই শিথিল ও গ্রন্থিহীন হইয়া পড়ে। একের সঙ্গে অপরের সুখদুঃখের ও পাপপুণ্যের এই যে বিপুল, এই যে জটিল বন্ধন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক, মায়িক, অলীক হইয়া দাঁড়ায়। তবে এ জগতে কে আর কার অপেক্ষা রাখে? কে কার জন্য দায়ী হয়? পিতা পুত্রের জন্য, পুত্র পিতার জন্য, পতি পত্নীর জন্য, পত্নী পতির

জন্য, প্রভু ভৃত্যের জন্য, ভৃত্য প্রভুর জন্য, রাজার প্রজার জন্য, প্রজা রাজার জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য, কারো জন্য কাহারো আর কোনো দায়িত্ব থাকে না।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন,
মোহমায়া নিদ্রাবশে, দেখিছ স্বপন,—

ইহাই সংসারের সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহের, প্রীতির, প্রেমের, ভক্তির, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, এ সকলের কিছুরই আর কোনো সত্য ও সারবত্তা থাকে না। এই যে পরস্পরাপেক্ষীভাব, ইহা হইতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলের উৎপত্তি। জীব কেবল আপনারই কর্ম্মফল ভোগ করিতে সংসারে আসে, কেবল আপনিই আপনার কর্ম্মের ভালমন্দ দ্বারা আবদ্ধ হয়, এ যদি সত্যই সত্য হয়,—তবে এ সকলের আর কোনো আশ্রয় রহিল কি? দশের কল্যাণের সঙ্গে একের কল্যাণ জড়িত, দশের ভালমন্দের উপরে একের ভালমন্দ প্রতিষ্ঠিত, দশের সুখের ভিতর দিয়া একের সুখ, দশের তৃপ্তির ভিতর দিয়া একের তৃপ্তি, দশের উন্নতির মধ্য দিয়া একের উন্নতির পন্থা,—এই যে সমাজস্থিতি হেতু, এই যে লোকধর্ম্ম,—এ সকলের আর কোন প্রতিষ্ঠা থাকে কই? ফলতঃ জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এ কথা সত্য; কিন্তু বহু লোকের বহু যুগের সঞ্চিত কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া সে জন্মায়, আর জন্মিয়া এই নিখিল বিশ্বের বিশাল কর্ম্মজালেতে সে আবদ্ধ হয়, এও অতি সত্য। যে কর্ম্মবোঝা লইয়া সে সংসারে আসে, তাহা এখানে আপনার স্বজাতীয় সমুদায় কর্ম্মকে টানিয়া আনে। পাপ পাপকে টানিয়া লয়, পুণ্য পুণ্যকে টানিয়া আনে। এইরূপে পরস্পরের সুকৃত দুষ্কৃতের বোঝা নিয়ত বাড়িয়া যায়। লৌহচূর্ণে মিশ্রিত গন্ধকচূর্ণের মধ্যে একখণ্ড চুম্বক ফেলিয়া দিলে যেমন আশে পাশের সমুদায় বিচ্ছিন্ন লৌহকণা তার গায়ে আসিয়া

আপনি লাগিয়া যায়, সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণীর নিজের সুকৃত দুষ্কৃত, চতুপার্শ্বস্থ জড় ও জীব সকলের পূর্ব্বসঞ্চিত ও অধুনাকৃত, সুকৃত দুষ্কৃতকে আপনার মধ্যে আনিয়া ফেলে। "তুমি কার কে তোমার" বলিয়া এ অপরিহার্য্য নিয়তি পরিহার করা যায় না। কেউ আমার, আমি কারো হই বা না হই,—আমার পাপ পুণ্যের ভাগী তারা, তাদের সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলভোগী আমি। এ সম্বন্ধ সত্য। এ সম্বন্ধ নিত্য। মায়িক বলিয়া, চক্ষু বুজিয়া, ইহাকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন?

ফলতঃ ইহা মায়িকও নহে। তোমাকে আমা হইতে, আমাকে তোমা হইতে, যে পৃথক, অসম্বদ্ধ বলিয়া ভাবি—এই যে আমি আমি তুমি তুমি করি, এই যে দুনিয়ার সুখ দুঃখের ভাগ বাটোয়ারা করিয়া আপনারটি আপনি গুছাইয়া লইতে চাই, ইহাই মায়ার খেলা। এই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানই মায়িক। কিন্তু তুমি আমি যে মূলে এক একই প্রাণসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ, একই জ্ঞানসূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিরণ খণ্ড—একই অনাদ্যনন্ত নিত্যপ্রদীপ্ত পাবকরাশির সামান্য স্ফুলিঙ্গমাত্র—ইহাই সত্য।

তদেতত্ সত্যম্—

যথা সুদীপ্তাত্ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।

তথাক্ষরাত্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥

ইহাই সত্য হে সৌম্য! যে যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ প্রসূত হয়, সেইরূপ অক্ষয় পুরুষ হইতে বিবিধ প্রাণীসকল জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই একেতে সকলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এই একে, সূত্রে মণিগণা ইব—সূত্রে যেমন হারের মণি সকল গাঁথা থাকে, তেমনি সকলে গাঁথা বলিয়া,—জড়ে ও জীবে এই বিচিত্র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে প্রাণ আমাতে, সেই প্রাণ তোমাতেও, তাই তোমাকে আমি বুঝি। যে জ্ঞান আমার

বুদ্ধিকে উন্মুক্ত করিতেছে, তাহাই তোমার বুদ্ধিকেও প্রকাশ করিতেছে বলিয়া তোমাকে আমি জানি, আমাকে তুমি জান। একই প্রেম, একই স্নেহ, একই দয়া, একই দাক্ষিণ্য,—সমুদায় বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে বলিয়া, আমার ও তোমার ও এই বিশাল জনসমাজের স্নেহ-প্রেম দয়া-দাক্ষিণ্যের সম্বন্ধসকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইতেছে। সেই মহান্ একে, সেই পরমতত্ত্বে, সেই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানে, সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধসকল প্রতিষ্ঠিত। তাঁহা হইতে যখন এগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখি, তখনই এসকল মায়িক হইয়া দাঁড়ায়, এসকলের কোনো সত্য ও সারবত্তা আর থাকে না। তখন সত্যি সত্যি,—

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন,
মিছে মায়া নিদ্রাবশে, দেখিছ স্বপন—

ইহাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমাকে ও আমার যাঁরা তাঁদের সকলকে যখন ভগবানের মধ্যে দেখি,—

এক ভানু অযুত কিরণে,
উজলে যেমতি সকল ভুবনে,
(তেমতি) তাঁর প্রীতি হইয়ে শতধা— বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি—

এই যখন প্রত্যয় করি,—তখন এই মায়াবরণ সরিয়া গিয়া, সংসারের সকল সম্বন্ধ, সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকল ভেদাভেদ, সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকে সত্য করিয়া তোলে। তখন আর "তুমি কার কে তোমার, কারে বলরে আপন,"—এই বলিয়া এই স্নেহ-প্রেম দয়া-দাক্ষিণ্যের, এই ধর্ম্মকর্ম্মের—গুরুতর দায়িত্ব ও কঠিন ঋণজাল এড়াইতে পারি না। তখন দেখি—

"আমি সবাকার, সবাই আমার,
বিশ্ব আমার আপন।

জগতের সুখ, জগতের আশা, যত ভালবাসা,—
সকলের ভাগী এ অধম জন।”

তখনই মিছে মায়া নিদ্রাবেশ কাটিয়া গিয়া,—দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভারতযুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের মত, ভগবদ্দেহে নিখিল বিশ্বের অনন্ত সম্বন্ধসকলকে যুগপৎ একস্থ ও পৃথকীভূত প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই ক্ষুদ্র প্রাণ ভগবদ্দেহে, ভাগবতী লীলার অঙ্গরূপে, এই বিশাল কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া, পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই বলি, এই এক রত্তি মানুষ, এই এক মুঠো রক্তমাংস, সামান্য বস্তু নহে। ব্রহ্মাণ্ডের অনাদিসঞ্চিত সমুদায় কর্ম্মের বোঝা মাথায় করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রাণ, এই সূতিকাগারে আসিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। ক্ষিত্যপতেজ-মরুৎব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতের যা কিছু দোষগুণ, তাহা সমুদায় ইহার এই সকল ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অভিনব আশ্রয় পাইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূতের গত কর্ম্মের বোঝা বহিবার জন্য এই শিশু এই ভৌতিক জগতে আসিয়া জন্মিয়াছে। যুগযুগান্ত সঞ্চিত এই ভৌতিক ঋণ সে শোধ দিতে এই মহাসংকল্প লইয়া জন্মিয়াছে—শোধ দিবে, না হয় এই ভৌতিক ঋণের শরশয্যাতেই তনুত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা লইয়া এই প্রাণ এই ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়াছে। তাই আমরণ এই সকল মহাভূত অহর্নিশ, অবিশ্রান্তভাবে, তার এই ভৌতিক দেহের সেবাতে নিযুক্ত রহে। আপনাদের অনাদিকৃত কর্ম্মবন্ধন এই ক্ষুদ্র প্রাণী আত্মবলিদানে নষ্ট করিবে, আপনাদিগের অনাদিকৃত পুণ্যফল এ পুষ্ট করিবে,—এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, এই সকল মহাভূত নবজাত ক্ষুদ্র প্রাণীর মুখপানে সতৃষ্ণ হইয়া চাহিয়া থাকে।

অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—ভূদেবতা, অন্তরীক্ষদেবতা, আকাশ দেবতাগণ,—সকলে আপন আপন কর্ম্মফল ক্ষয়ের প্রত্যাশায়, আপন আপন অমরজীবনের সার্থকতালাভের লোভে, এই মরপ্রাণীর দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পালন করে যারা, এই ক্ষুদ্র প্রাণের সম্মুখে ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া থাকে তারা। দেবপিতৃলোকেরা ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, এক হাত তুলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রাণকে আশীর্ব্বাদ করেন, আর অপর হাত পাতিয়া ইহার নিকটে আপন ঈপ্সিত যাচ্ঞা করেন। দেবতারা যজ্ঞাহুতি লোভে, ঋষিরা জ্ঞানবিজ্ঞানের লোভে, পিতৃগণ কুলস্থিতিপ্রার্থী হইয়া, ভিখারীবেশে এই ক্ষুদ্র প্রাণের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহারা সকলে আপন আপন জীবনের সফলতা কামনা করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রাণের বন্দনা করেন :—

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ, সূর্য্যএষ, পর্জন্যো মঘবনেষ, বায়ুরেষ, পৃথিবী রয়িদৈবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যত্।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥
প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈ প্রতিতিষ্ঠসি
দেবানামপি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাঞ্চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥
ইন্দ্রস্ত্বং, প্রাণ, তেজসা, রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরীক্ষে চরসি, সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥
ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥
যা তে তনু বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চক্ষুষি।

যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু, মোত্‌ক্রমীঃ॥
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যত্‌ প্রতিষ্ঠিতম্‌।
মাতেব পুত্রান রক্ষস্ব, শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিদেহিন—ইতি॥

এই প্রাণই অগ্নির মত প্রদীপ্ত হন, ইনিই সূর্য্য, ইনিই পর্জ্জন্য, মঘবন, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী,—ইনিই এই বিশ্বের উপাদান—রয়ি, এই প্রাণদেবতাই স্থূল ও সূক্ষ্ম, নিত্য ও অনিত্য যাহা কিছু তৎসমুদায়।

অরাসকল যেমন রথচক্রে সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণেতে সংযুক্ত রহিয়াছে। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ—এ সকল এই প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত, এই প্রাণাপেক্ষী হইয়া আছেন।

হে প্রাণ, তুমি প্রজাপতি; তুমিই গর্ভে বিচরণ কর, তুমিই গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হও। হে প্রাণ, তুমি এই ইন্দ্রিয়গ্রামের আশ্রয় হইয়া আছ। তোমারই জন্য তোমার এই সকল প্রজা নিয়ত বলি আহরণ করে।

হে প্রাণ, তুমিই দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ অগ্নি, পিতৃগণের প্রথম সর্ব্বোত্তম স্বধা, ঋষিদিগের আচরিত সত্য তুমি, অঙ্গিরসদিগের আদিগুরু অথর্ব্ব তুমি।

হে প্রাণ, বীর্য্যে তুমি ইন্দ্র, রক্ষণে তুমি রুদ্র, তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমিই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পতি সূর্য্য।

হে প্রাণ, তুমি স্বয়ং শুদ্ধ—তোমার শুদ্ধির আবশ্যক হয় না। তুমি একর্ষি অগ্নি। তুমি বিশ্বের ভোক্তা, সৎপতি। তুমি মাতরিশ্বের জনক, আমরা সকলে তোমার ভোজ্য বাহক।

হে প্রাণ, তোমার যে স্বরূপ বাগিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত, যাহা শ্রোত্রে, যাহা চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত;—তোমার যে স্বরূপ মনোমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে,—তাহাকে তুমি কল্যাণপ্রদ কর। হে প্রাণ, তুমি উৎক্রমণ করিও না।

হে প্রাণ, এই ত্রিদিবে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় তোমারই বশীভূত। মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা প্রদান কর।

দেবপিতৃলোকে পূজ্য এই প্রাণ,—ইহাকে যদি ভালবাসি, তাহা তো গৌরবের কথা, তার জন্য লজ্জিত হইব কেন? দুঃখ এই—তাকে ভাল করিয়া ভালবাসিতে পারিলাম না। দুঃখ এই—অনন্তকাল এই প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া এ সংসারে বসবাস করিলাম, কিন্তু মোহবশতঃ, প্রমাদালস্য নিদ্রাভিভূত হইয়া, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ও যথার্থ মর্য্যাদা বুঝিলাম না। এই প্রাণদেবতাকে ভাল করিয়া এখনো চিনিলাম না, ইহাকে ভাল করিয়া এখনো দেখিলাম না,—ইহাই তো এ জনমের সকল দুঃখের চাইতে বেশী দুঃখ। প্রাণের সঙ্গে, প্রাণের মধ্যে, প্রাণের কৃপাতে এ সংসারে এ দীর্ঘ জীবন কাটাইলাম, তবু ইহার পরিচয় পাইলাম না, ইহার গৌরব বুঝিলাম না, এই তো জন্মের সকল ক্ষোভের চাইতে বেশী ক্ষোভ। মাছ যেমন জলে জন্মে, জলে থাকে, জলেতেই জীবনের আনন্দ সফলতা লাভ করে, অথচ জল কি তাহা জানে না; পাখী যেমন আকাশে থাকে, আকাশে উড়ে, আকাশেই তার জীবন ও জীবনের অশেষ আনন্দ সম্ভোগ করে, অথচ এই কিরণ-বরণ-শব্দ-গন্ধ পূরিত বায়ুমণ্ডল কি বস্তু তাহা আদৌ জানে না, বুঝে না;—তেমনি আজন্মকাল এই প্রাণের মধ্যে, এই প্রাণের সঙ্গে, এই প্রাণকে লইয়া এ সংসারে বাস করিলাম, ইহারই দৌলতে, এই সকল সুখসাধক ইন্দ্রিয়ের সহায়ে, ক্ষুদ্র হইয়াও এই বিশাল কাম্য বস্তু-পূর্ণ বিষয়-রাজ্য, রাজার মত ভোগ করিলাম, অথচ এই প্রাণকে জানিলাম না, ইহার মর্য্যাদা বুঝিলাম না, ইহার আদর করিলাম না, একবার ইহার প্রতি ভাল করিয়া চাহিলাম না। এইতো দুঃখ। এখন দিন ফুরাইয়া আসিল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, শরীর দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া আসিল, এখন যদিই বা এই প্রাণের প্রতি

একটু মমতা জন্মে, তাহাতে বিস্ময়ের, লজ্জার, দুঃখের, বা অপরাধের কথা কি ?

ফলতঃ এ প্রাণকে কখনো, সত্যভাবে ভালবাসি নাই। যে যাকে ভালবাসে সে তার শ্রীবৃদ্ধিকামনা করে। যে যাকে ভালবাসে সে তার সেবা করে। এ জনমে প্রাণের শ্রীবৃদ্ধি চাহিলাম কৈ ? প্রাণের সেবা করিলাম কৈ ? এই প্রাণাশ্রিত ইন্দ্রিয়কুলের সেবা করিয়াছি, এদের মুখ চাহিয়া আজন্ম চলিয়াছি, এদের সুখ দিতে দিতে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু প্রাণের আরাধনা করিলাম কই ? প্রাণের মর্য্যাদা যদি জানিতাম, প্রাণকে যদি সত্য সত্য ভালবাসিতাম, তবে এই সকল বিষয়, ও এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাণেরই সেবা করিতাম, প্রাণের দ্বারা এদের সেবা করিতে যাইয়া আজ প্রাণান্ত হইয়া পড়িতাম না। খাদ্যা-খাদ্য নির্ব্বাচনে রসনার তুষ্টি কিসে হয়, তাই দেখিতেছি, প্রাণের পুষ্টি কিসে হবে, তা ভাবি কৈ ? এইরূপ চোখে কি দেখায় ভাল তাই দেখি, কানে কি শোনায় ভাল তাই শুনি, স্পর্শে কি লাগে মিষ্টি তাই ছুঁই, কোন্ দৃশ্যে, কোন্ শব্দে, কোন্ স্পর্শে, যে প্রাণ হৃষ্ট ও পুষ্ট হইবে, সে বিচার করি কৈ ?

আদিপুরুষ যেমন প্রজাকামনায় আপনি বহু হইয়াছেন, সেইরূপ প্রাণকে সত্য সত্য যে ভালবাসে, সে প্রাণকে বহু করিতে চাহে, এবং সে সংসার-ব্রত গ্রহণ করে। বহুস্যাং প্রজায়েহতি ; আমি এতদ্বারা প্রজোৎ-পাদন করিয়া বহু হইব, এই পবিত্র কামনা লইয়া প্রাণের জন্য প্রাণের প্রয়োজনে যাহারা গৃহী হয়, তারা প্রজাকামনায় সংসার করে, ইন্দ্রিয় ভোগের লালসায় নহে। ফলতঃ প্রাণের মর্য্যাদা যে জানে, সে এইরূপেই প্রাণের মর্য্যাদা রক্ষা করে। তোমরা ইহাতে সম্ভ্রম নষ্ট হইল বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিও না, আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, প্রাণের মর্য্যাদা যে জানে, কামের মর্য্যাদা সে বোঝে। সে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মাহাত্ম্য

ও দেবত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বদা বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। শ্রুতি কহেন—

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোহঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি তদস্য প্রথমং জন্ম।

তৎস্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি।

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী-গর্ভং বিভর্ত্তি সোহগ্রএব কুমারং জন্মনোহগ্রেহধিভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনেহগ্রেহধিভাবয়ত্যাত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম।

সোহস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মেভ্যঃ প্রতিধীয়তে।—ঐতরেয়োপনিষৎ।
এই আত্মা (বা পরমাত্মা) প্রথম হইতেই বীজরূপে পুরুষের মধ্যে বাস করেন। এই বীজই তাহার সকল অঙ্গের তেজ বা সারভাগ, এই বীজকে ধারণ করিয়া সে আপনার শরীরে সেই আত্মাকেই ধারণ করে। এই বীজ যখন স্ত্রীতে সঞ্চিত হয়, তখনই এই আত্মার প্রথম জন্ম হয়।

এই আত্মা তখন স্ত্রীর নিজের অঙ্গের ন্যায় তাঁহার আত্মভূত হইয়া যায়। সেই স্ত্রী তখন সেই আত্মাই আমার মধ্যে বাস করিতেছেন, ভাবিয়া ইহাকে পোষণ করেন।

তখন স্ত্রী পোষণযোগ্যা হন। স্ত্রী এই বীজকে গর্ভে ধারণ করেন। এই সন্তানের জন্মের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে পিতা ইহার সেবা করিয়া থাকেন। গর্ভস্থ শিশুর পরিচর্য্যা করিয়া পিতা আপনার আত্মারই পরিচর্য্যা করেন। এইরূপে সংসারে স্থিতি রক্ষা পায়, সংসারস্থিতি রক্ষার্থে পিতা গর্ভস্থ শিশুর সেবা করেন। ইহাই আত্মার দ্বিতীয় জন্ম।

এই কুমার সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকর্ম্ম সাধনে পিতার প্রতিনিধি হইয়া সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করে।

প্রাণকে সত্য সত্য যে ভালবাসে সে ঋষি না হইয়াও এই প্রাচীন মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করে। তাহার নিকটে এই সকল তত্ত্ব আপনি ফুটিয়া উঠে। পত্নী পতির প্রাণকে বহু করেন, তারই জন্য তাঁহারা পরস্পরের এত প্রিয়। পঙ্কে যেমন দেবভোগ্য পবিত্র পঙ্কজের উৎপত্তি, সেইরূপ পতিপত্নীর ইন্দ্রিয়বিকার হইতেই বিশ্বপূজ্য এই প্রাণের প্রকাশ হয়। কাম বলিয়া এই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ও সম্ভোগকে ঘৃণা করিতে পারি না। ইহাকে যদি কাম বলিতে হয় বল, ক্ষতি নাই। পূর্ব্বতন ঋষিগণ নিঃসঙ্কোচে ইহাকে কাম বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু একথা ভুলিও না যে এ সেই কাম, যে কাম হইতে বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যে কামনায় স্রষ্টা, সৃষ্টিতপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন—সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েঽতি,—স তপস্তপ্যত, স তপস্তপ্যত সর্ব্বমিদমসৃজত যদিদং কিঞ্চ,—এ সেই কাম। যে কামাগ্নি প্রথম পুরুষ-যজ্ঞে আহুত হইয়াছিল, যাহা হইতে ঋক্, যজু, সাম—সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎপত্তি, যাহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বিশ্—সকল সমাজশৃঙ্খলার সৃষ্টি, যাহা হইতে সকল যজ্ঞের, সকল ধর্ম্মের, সকল কর্ম্মের, সূচনা এ সেই কামাগ্নি। ইহাই সৃষ্টির আদি, তাই ইহাকে আদিরস কহে। ইহা হইতেই সকল লাবণ্যের, সকল কারুণ্যের, সকল সৌন্দর্য্যের, সকল মাধুর্য্যের, সকল শৌর্য্যের ও সকল বীর্য্যের বিগ্রহরূপী কামদেবতা কন্দর্পের জন্ম। প্রজা সৃষ্টিব্যাপারে ইহাই ভগবানের চিদানন্দবিভূতি—প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ—হে অর্জ্জুন, প্রজাসৃষ্টি হেতু আমিই কন্দর্প। প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি, ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ—সম্ভোগমাত্র প্রধান যে কাম, তাহাই নিকৃষ্ট, তাহাই হীন ও হেয়, তাহা ভগবদ্বিভূতি মধ্যে পরিগণিত হয় না। কিন্তু প্রজোৎপত্তি হেতু যে কাম তাহাই ভাগবতী লীলার অঙ্গ, তাহাই ভগবদ্বিভূতি।—এ সেই কাম। বেদ

নিঃসঙ্কোচে ইহারই কথা বলেন। বেদান্ত পবিত্র দৃষ্টিতে ইহাকেই ব্রহ্মানন্দের মাপকাঠি করিতেও শঙ্কা বোধ করেন না। পুরাণ এই কামকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এই কামদেবতাই সৃষ্টির মেরুদণ্ড স্বরূপ, ইনিই জগতে প্রাণী-প্রবাহ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইহারই সাহচর্য্যে প্রাণ আপনার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যে প্রাণের মর্য্যাদা বোঝে, সে এই পবিত্র কামেরও মর্য্যাদা জানে।

প্রাণের মর্য্যাদা জানি না বলিয়া, এই কামেরও মর্য্যাদা ও শুদ্ধতা বুঝি না। তাই কামের নামে, মিথ্যা লজ্জাভাবে, কাণে হাত দেই। তাই "প্রজায়ৈঃ গৃহমেদিনঃ"—প্রাচীনেরা প্রজার জন্য সংসারী হইতেন, এ কথা পড়িয়া ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করি। তাই—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—পূর্ব্বপুরুষদিগের এই আদর্শকে হীন বলিয়া উপেক্ষা করি। মনে ভাবি, আমরাই বুঝি দাম্পত্যসম্বন্ধের উন্নত আদর্শ ও প্রেমের বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। যে প্রেম রমণীয়তাকেই রমণীর শ্রেষ্ঠ ও সত্য স্বরূপ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে যায়, তাহার কামোপভোগপ্রবৃত্তি কি সাংঘাতিক ইহা একবারও তাকাইয়া দেখি না। রমণীর জন্যই পুরুষকে ও পুরুষের জন্যই রমণীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া,—পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধকে অতি লঘু, অতি হীন করিয়া তুলিয়াছি, ইহা বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত যাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তারা প্রাণের মর্য্যাদা বোঝে না। ইহা আর বিচিত্র কি? কামকে লোকে পশুবৃত্তি বলে; কিন্তু এই সম্ভোগমাত্র-প্রধান প্রেম যে পশুবৃত্তি অপেক্ষাও অধম ইহা ভাবে না। পশুপক্ষীর মধ্যেও এ সম্বন্ধ এতটা কামোপভোগ-প্রধান নহে। এই বিশাল বিশ্বের অপর সর্ব্বত্র এই বিচিত্র কামলীলার মধ্যে নির্ব্বাহস্বরূপে প্রজোৎপত্তির চেষ্টাই প্রত্যক্ষ করি, সভ্যতাভিমানী মানুষেই কেবল ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এখানেই কেবল দেখি, জীব কেবল-মাত্র ভোগের জন্য রূপের অনুশীলন করে। কেবল আমোদের তৃপ্তি হেতুই,

কেহ বা সমাজবিধির আবরণের মধ্যে থাকিয়া, কেহ বা এই সূক্ষ্ম আবরণকেও তুচ্ছ করিয়া,—স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। বিশ্বের আর কোথাও কামদেবতার এমন দুর্গতি হয় নাই। নববসন্ত সমাগমে বনরাজি যে নব জীবনের উচ্ছ্বাসে অপূর্ব্ব বরণকিরণগন্ধে বিশ্বপ্রাণকে বিমোহিত করিয়া তোলে, সে কি কেবল আপনার রূপ-যৌবনের বাহার জাহির করিবার জন্য? অসংখ্য কীটপতঙ্গের মন ভুলাইবার জন্যই বনরাজি এ বিচিত্র রূপের হাট খুলিয়া বসে, সত্য। রং ফুটাইয়া এরা প্রজাপতিকুলকে আহ্বান করে, গন্ধ ছুটাইয়া মধুপশ্রেণীকে মাতাইয়া বুকে টানিয়া লহে,—এ সকলই সত্য। কিন্তু প্রজাপতির মন ভুলান, মধুপেরে লোভ দেখানো,—ইহাদের রূপ ও রসের মুখ্য লক্ষ্য নহে। এ সকল কেবল ছলাকলা মাত্র। মূল লক্ষ্য এদের প্রাণেরই উপরে পড়িয়া থাকে। প্রজাপতির পাখায় চড়াইয়া, ভৃঙ্গের পাতায় জড়াইয়া, পুষ্পিত বনরাজি আপনার প্রাণকে বনস্থলীময় ছড়াইয়া দিতে চাহে। আপনার কেশররাজি বিলাইয়া নূতন উদ্ভিদপ্রাণ সৃষ্টি করিবার জন্যই তরুলতা এত যত্ন করিয়া বিচিত্র বরণকিরণগন্ধে আপনাদিগকে সাজাইয়া, অচল বলিয়া নিজেদের যাহা সাধ্যাতীত, চঞ্চল পতঙ্গকুলকে প্রলুব্ধ করিয়া, সেই কার্য্য সাধিয়া লহে। বাসন্তী বনস্থলীর এই অপূর্ব্ব কামলীলা যখন ধ্যান করি, তখন সত্য সত্য প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ—এই ভগবদ্বাক্যের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই। যেমন উদ্ভিদে সেইরূপ যাদের ইতর প্রাণী বলি, তাদের মধ্যেও এই প্রজোৎপত্তির জন্যই রূপ রসের অদ্ভুত লীলা দেখিতে পাই। বিধাতা কুক্কুটের চূড়া, ময়ূরের পাখা, প্যারাডাইজ পাখীর অদ্ভুত পালক-সম্পদ, কোকিলের মধুর কণ্ঠ খঞ্জনের মনোহর নৃত্য—এ সকলের কিছুই কেবল পরস্পরের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ইহাদিগকে দান করেন নাই। পাখীদের কামলীলাতে কি যে অদ্ভুতভাবে বন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কত ছলাকলা যে তারা জানে, প্রিয়জনের মন ভুলাইবার জন্য কত ফন্দি

নষ্টি যে তারা করে, বিহগকুলের গতিবিধি যাঁরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁরা তা জানেন। বাওয়ার পাখী প্রিয়তমকে ভুলাইয়া আপনার কুঞ্জে আনিবার জন্য যেমন করিয়া তার কুঞ্জটী সাজায়, প্যারাডাইজ পাখী যেমন করিয়া আপনার রূপের বাহার খুলিয়া নাচে, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, যেমন করিয়া গান করে,—মানব সমাজে কোনও নায়ক আজ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা, সে চাতুর্য্য, সে মাধুর্য্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ সাজসজ্জা, এ নাচগান, এ ছলাকলা, এ ফষ্টিনষ্টি, এ সকলের ভিতর দিয়া ঐ বিশ্বজনীন প্রাণন চেষ্টা,—প্রজাপতির সেই অনাদি আদি সঙ্কল্প 'বহুস্যাং প্রজায়েহ্‌তি' তাহাই ফুটিয়া উঠিতেছে। মন ভুলান—উপায়; প্রজোৎপত্তি, প্রাণের সেবা, প্রাণের সৃষ্টি, প্রাণস্থিতি রক্ষা, প্রাণধারার পুষ্টি,—এই সকল কামলীলার ইহাই এক মাত্র নিগূঢ় লক্ষ্য। পশুদের মধ্যেও তাহাই দেখি,—তারাও প্রজননের জন্যই—আপনাদিগকে বহু করিবার উদ্দেশ্যেই, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ—ভগবানের এই যে চিদানন্দবিভূতি ইহা ইতর জীবজগতে শুদ্ধভাবে বিরাজ করিতেছে। মনুষ্যের মধ্যেই এই পবিত্র কামপ্রবৃত্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, সম্ভোগমাত্র-প্রধানা হইয়াছে।

মানুষ যখন সহজ মানুষ ছিল, তখন সে প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিত, তখন তার রূপের আস্বাদন, যৌবনের সম্ভোগ, সকলই স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাণাপেক্ষী ছিল। স্বাস্থ্যই তখন রূপের প্রধান মাত্রা ছিল। পুরুষের শৌর্য্যে, রমণীর মাধুর্য্যে, তখন রূপের মাত্রা হইত। তেজই শৌর্য্যের ধর্ম্ম,—আর যদেতপ্রেত স্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽপেস্তেজ—পুরুষের সকল অঙ্গের তেজের সারভূত যে বীর্য্য—তাহাই শৌর্য্যের একমাত্র মাপকাটী। এই তেজই পুরুষের পুরুষত্ব, এই পুরুষত্বের আভাই পুরুষের প্রকৃত রূপ। সুগঠিত দেহ এই পুরুষত্বকে প্রকাশ করে। আয়ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ, এ সকল শৌর্য্যবীর্য্যের

পরিচায়ক, এসকল পুরুষত্বের কায়ব্যূহ স্বরূপ, তাই এ সকল রূপের তটস্থ লক্ষণ। প্রকৃতরূপে পুরুষের রূপের স্বরূপ লক্ষণ তার পুরুষত্ব; তার প্রজোৎপত্তির যথার্থ সামর্থ্য। পুরুষের রূপ যেমন শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, রমণীর মাধুর্য্য তেমনি মাতৃত্বে। জঘন্য লোকের হাতে পড়িয়া রমণীর প্রকৃত রূপের দাবীটাও অতি হীন ও লঘু হইয়া পড়িয়াছে;—কিন্তু যাঁরা প্রথম রমণী সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে যাইয়া—গুরু নিতম্ব, পীন পয়োধরের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁরা যে মাতৃত্বকেই রমণীর মাধুর্য্যের প্রধান মাপ-কাঠি করিয়াছিলেন, এ কি অস্বীকার করিতে পারি? রমণীর রূপ কেবল তার চোখে বা নাকে, রংএ বা কেশে নহে;—কিন্তু তার দেহে, তার অঙ্গ বিন্যাসে ও অঙ্গ বিকাশে; চোখ তার মোহিনী শক্তিমাত্র প্রকাশ করে। নাকে মুখে, বর্ণে, কেশে—তার স্বাভাবিক সুস্থতা, দেহের নিরোগ নির্ব্বিকার ভাব মাত্র জ্ঞাপন করে। কিন্তু প্রকৃত রূপ তার অঙ্গবিকাশে, তাহাতেই তার মাতৃত্ব ফুটিয়া উঠে। ডালিম যেমন আপনার রসে আপনি ফাটিয়া পড়ে, সেইরূপ আপনার অন্তর্নিহিত মাতৃত্বের উচ্ছ্বাসে যে রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভরা জোয়ারে ভরা গাঙ্গের মত অপূর্ব্ব স্থিরচঞ্চলভাব ধারণ করে,—সেই ভারে যিনি সন্নতাঙ্গী, সেই ভারে যিনি মন্থরগামিনী, সেই অজাত অজ্ঞাত রসের উচ্ছ্বাসে যিনি সমুদ্ভাসিতা,—সেই রমণীই তো প্রকৃত রূপবতী। রমণীরূপের উৎকর্ষ গণেশজননীতে;—রমণী সৌন্দর্য্যের পরিপক্কতা ও পরিণতি—ম্যাডোনায়। গণেশজননী যারা গড়িয়াছিল, মাড্যোনা যারা আঁকিয়াছিল, তারা প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল, তাই শ্রেষ্ঠতম রমণীরূপকে তারা মাতৃমূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছিল, তাদের রূপের জ্ঞান সহজ, স্বাভাবিক, সত্য ও পবিত্র ছিল। আর আমরা,—আমরা প্রাণের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া প্রকৃত কামের মর্য্যাদা হারাইয়াছি। আমরা তাই রূপের মরকত আসনে পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া রতিকে,

ম্যাডোনাকে উপেক্ষা করিয়া ভিনাসকে বসাইতেছি। তাই পুরুষ এখন রমণীর রূপ খুঁজেন তার চোখে ও মুখে, রমণীও পুরুষের রূপ দেখেন তার পোষাকে! "গুরু নিতম্ব, পীন পয়োধর"—শুনিলে এখন আমাদের সুরুচি শিহরিয়া উঠে; কিন্তু টুকটুকে ঠোঁট, টুকটুকে গাল, ঢল ঢল চোখ, ঢেউখেলান চুল,—এ সকল সহজই হউক বা সাধিতই হউক, এ সকলে স্বাস্থ্যের গুণই জ্ঞাপন করুক আর কস্‌মেটিকের কৌশলই গোপন করুক,—এ সকলে আমাদের বিশুদ্ধ রুচি পীড়িত হয় না। অথবা এ সকলে কেবলমাত্র কামোপভোগ করিবার জন্য সভ্যতার ছলাকলার মোহিনী মূর্ত্তিই প্রকাশ করে, মাতৃত্বের দেবী-প্রতিমার কোনই সন্ধান দেয় না।

প্রাচীনেরা প্রাণের মর্য্যাদা জানিতেন, তাই প্রজোৎপত্তির জন্য সংসার করিতেন। প্রাচীনারা প্রাণের মহত্ত্ব বুঝিতেন, তাই দেবতার নিকটে সন্তান কামনা করিতেন। কোন রমণী সন্তান সম্ভাবিতা হইয়াছেন, এ কথা প্রকাশ করা, ইহার আলোচনা করা সেকালে তাই শিষ্টাচার-বিরোধী ছিল না। সন্তান-সম্ভাবিতাকে লইয়া সমাজ আনন্দোৎসব করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। আমরা প্রাণের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া এ সকলকে হীন, নিকৃষ্ট, অকথ্য বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁরা প্রজোৎপত্তিকে জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, আমরা ম্লেচ্ছ সমাজ-বিজ্ঞানের উদ্‌ভ্রান্ত মত ও আসুরী আদর্শের দ্বারা অভিভূত হইয়া, "ফিলজফির ফল" আহরণ করিয়া, যাহাতে প্রজোৎপত্তি না হয় বা কম হয়, তারই চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু প্রাচীনেরা—"প্রজায়ৈঃ গৃহমেধিনঃ"—প্রজোৎপত্তির জন্য গৃহী হইতেন বলিয়া, অসংযত কামোপভোগে প্রবৃত্ত হইয়া বিড়াল-ছানার মত রাশি রাশি মানবছানা উৎপাদন করিয়া পৃথিবীকে পীড়িত, সমাজকে দুঃস্থ ও স্বজাতির শৌর্য্যবীর্য্য সমূলে নষ্ট করিতেন না।

কিশোর বয়সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা আপনাদের পুরুষত্বকে সুরক্ষিত ও পরিপুষ্ট করিয়া, পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তিতে, বলিষ্ঠ দেহে, নির্ম্মল মনে তাঁহারা ব্রহ্মবর্চ্চস-সম্পন্ন হইয়া, জীবনের দশসংস্কারের প্রধান সংস্কার জ্ঞানে, পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন; এবং গার্হস্থ্যজীবনে দাম্পত্যসম্বন্ধকে বহুবিধ বিধিনিষেধের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, একই সঙ্গে কামের মর্য্যাদা রক্ষা ও প্রাণের পুষ্টিসাধন করিতেন। এই সকল উপায়ে, এই সকল সংযম ও নিয়মের শাসনের প্রভাবে প্রাচীন-সমাজে অযথা প্রজোৎপত্তি নিবারিত হইত। আর সেকালে সমাজে সংযমের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ম্যালথাসের নীতি অনুসরণ বা "ফিলজফির ফল" আহরণ করা একান্তই অনাবশ্যক ছিল।

ফলতঃ কাম ও প্রাণ, ছায়াতপের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে নিয়ত বাস করে। যেখানে ছায়া একান্ত আতপ-বিরহিত হইয়া পড়ে, সেখানে যেমন কেবলমাত্র গাঢ়তম অন্ধকারের প্রতিষ্ঠা হয়, সেইরূপ কামও যেখানে প্রাণসম্পর্ক বিরহিত হয়, প্রাণের সঙ্গে যেখানে তাহার একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে, সেখানেই তাহা নিতান্ত সম্ভোগমাত্র-প্রধান হইয়া উঠে। আর যেখানেই এইরূপ যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সেবার লালসা রোধ করা অনাবশ্যক বা অসাধ্য বোধ হয়, সেখানেই কেবল প্রজাবৃদ্ধি নিবারণের জন্য বিবিধ অস্বাভাবিক ও আসুরী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যে পরিমাণে যেখানে প্রাণের মর্য্যাদা নষ্ট হইতে আরম্ভ করে, সেখানে কামও আপনার পবিত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবলমাত্র সম্ভোগ-প্রধান হইয়া পড়ে; আর যেখানে আবার কামলিপ্সা নিতান্ত বলবতী ও স্বেচ্ছাচারিণী হয়, সেখানে প্রাণের মর্য্যাদা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে।

প্রাচীনেরা প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিতেন, তাই কামেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, প্রাচীন সমাজে অশেষবিধ বিধিনিষেধাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক সভ্যতা সে সকল তিথি নক্ষত্রাদির বিচারকে

হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু prostitution in married life নামে যে অদ্ভুত অসুর তাহার দাম্পত্য-সম্বন্ধকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে, তাহার দমনের উপায় এখনও খুঁজিয়া পায় নাই। কেহ বা ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা, কেহ বা রাজবিধির সাহায্যে এই অনিষ্ট নিবারণের প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এ রোগের নিদান নির্ণয়ের শক্তি ও প্রবৃত্তি কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক সভ্যতা নামে যে আদর্শ ও সাধনা জগৎকে আচ্ছন্ন করিতে চাহিতেছে, তাহার মূল পর্য্যন্ত সংশোধন না করিলে, এই রোগের উপশম কখনও হইতে পারে না। কিন্তু বোঝে কে? এ কথা মুখ ফুটিয়া বলে, এমন বুকের পাটাই বা ক'জনার আছে?

তৃতীয় চিন্তা

নিজের কথা

প্রথম অধ্যায়

ভগবৎ কৃপায়, এই সংসারে এই জন্মেই, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। এই অর্দ্ধশত বৎসরের প্রতি যখন ফিরিয়া চাহি, ভগবানের অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই। এ জীবনে সুখ দুঃখ অনেক পাইয়াছি, কিন্তু এই জীবনব্যাপী চেষ্টার সফলতা নিস্ফলতার এক কণামাত্রও আজ পরিবর্ত্তন করিতে সাধ হয় না। এ জন্মে অপরাধ অনেক করিয়াছি। লোকে যাহাকে পাপ বলে, তারও গণনা করা সম্ভবপর নহে। প্রতিদিনই শতবার আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। যাহা বলা উচিত ছিল না, তাহা বলিয়াছি, যাহা করা উচিত ছিল না, তাহা করিয়াছি; জীবনের বিবিধ সম্বন্ধের যথা কর্ত্তব্য পদে পদে অবহেলা করিয়াছি। গুরুজনের প্রাপ্য গুরুজনকে দেই নাই। পিতার আদেশ অহংবশে শতবার অমান্য করিয়া তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ দিয়াছি। তাঁর সে অতুল স্নেহের মর্য্যাদা, তাঁহার জীবদ্দশায় দিনেকের তরেও বুঝি নাই, রাখি নাই। বন্ধুবান্ধবদিগের উপর সতত আব্দার করিয়াছি, কত উপদ্রব করিয়াছি। কিন্তু কখনো প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রণয়ের মর্য্যাদা রাখি নাই, সর্ব্বদা নিজের খেয়ালের বা প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁদের অনুরোধ উপরোধ সকলই পায়ে ঠেলিয়া চলিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া যখন সংসার পাতিলাম, নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম, সতীর প্রেম, পুত্রকন্যার ভক্তি ও ভালবাসা এ সকলও যখন পাইলাম, তখনও আপনাকে ছাড়িয়া ইহাদের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহাও ভাল করিয়া পালন

করিতে পারি নাই। সংসারের কোন কর্ত্তব্যই পালন করা হয় নাই। অপরাধ লোকে যাকে বলে, আমার জীবনে তার গণনা হয় না, দোষ আমার অগণ্য। পাপ আমার অসংখ্য, কিন্তু এ সকলের জন্য, কখন প্রাণে বিন্দু পরিমাণেও প্রকৃত অনুতাপের উদ্রেক হয় নাই। অনুশোচনা মাঝে মাঝে ভোগ করিয়াছি; ক্লেশ পাইয়া, অভাব দেখিয়া, নিরাশায় পড়িয়া, সুখ বা সম্মানের হানি আশঙ্কা করিয়া, সময়ে সময়ে গভীর অনুশোচনা হইয়াছে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনুতপ্ত হই নাই। আর আজ এই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর কর্ম্মাকর্ম্ম লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিয়া, অকপটে এ কথা বলিতে পারি, যে এ জীবনের মানচিত্রে একটী ক্ষুদ্রতম, সূক্ষ্মতম রেখাও পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হউক, ইহা কখনই ইচ্ছা করি না।

হে ভগবন্, সত্য সত্য আজ তোমাকে জীবনের যা অকর্ম্ম করিয়াছি, আর যা সুকর্ম্ম করিয়াছি তৎসমুদায়ের জন্য ধন্যবাদ করি। যা সুখ পাইয়াছি আর যা দুঃখ ভুগিয়াছি তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। মিলনের আনন্দ যাহা দিয়াছ, বিচ্ছেদের দাহন যাহা দিয়াছ, তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। অনেক চাহিয়াছি, তাহা দিয়াছ, আবার অনেক চাহিয়াছি তাহা দাও নাই, তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। অযাচিতভাবে যাহা মুখে তুলিয়া দিয়াছ, বুকে আনিয়া রাখিয়াছ, আর কাঁদিয়া কাটিয়াও যাহা তোমার নিকট হইতে পাই নাই, লুব্ধ করিয়া যাহা প্রাণের দরজা হইতে ফিরাইয়া লইয়াছ, সে সমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি। প্রভো! জীবনে ভুলভ্রান্তি অসংখ্য হইয়াছে, কত অসত্যকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, কত সত্যকে অসত্য বলিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছি, তৎসমুদায়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমার অহঙ্কার ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা, ভোগ ও

বৈরাগ্য, অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম, অকর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য, অজ্ঞান ও জ্ঞান, অভক্তি ও ভক্তি, আরম্ভ ও অনারম্ভ, বন্ধন ও মোক্ষ, মান ও অমানিতা, বিপদ ও সম্পদ, বিচ্ছেদ ও মিলন, নিরাশা ও আশা সকলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি।

কোন্ প্রাণে, ঠাকুর, আবার বলিব যে এ জীবন এমন হইলে ভাল হইত? ভাল কাকে বলে, আর মন্দ কাকে বলে, আমি কি তা জানি, না যাহা সময় সময় ভাল মন্দ বলিয়া মনে হয়, তাহাই আমি স্ব চেষ্টায় লাভ বা বর্জ্জন করিতে পারি? যদি তা পারিতাম, যদি তা বুঝিতাম, সে ভার যদি আমার উপরে তুমি রাখিতে, তবে তোমার ঈশ্বরত্ব, তোমার বিধাতৃত্ব, তোমার নিয়ন্তৃত্ব কোথায় থাকিত, প্রভো! তবে কে তোমাকে "লা সরিক্" বলিতে পারিত? তাহা হইলে এ সংসার যে ভাগের সংসার হইয়া পড়িত। তাহাকে বহু কর্ত্তা, বহু প্রভু, বহু বিধাতা আসিয়া দখল করিতে চেষ্টা করিতেন। আর যদি কেহ বলে যে জীবনের দুঃখের মোহের পাপের কর্ত্তা আমি, আর সুখের, জ্ঞানের, পুণ্যের কর্ত্তা তুমি; তোমার সঙ্গেও, ক্ষমা কর, তেমন ভাগের ব্যবসায়ে আমি রাজি নই। লাভ টুকুন তুমি সব নিবে, আর লোক্সান যত সব আমার হাতে দিবে, এ তো মানুষের হিসাবেও ন্যায়পর হয় না, ন্যায়বান ঈশ্বর, তোমার বিধানে কি এ ব্যবস্থা কখন সম্ভব হইতে পারে? যদি পাপ আমার হয় তবে পুণ্যও আমারই। মন্দের ভাগী যদি আমি হই, তবে ভালরও পুরা ভাগ দিতে হবে। আর তাই যদি হয়, তবে আমি কেবল কর্ম্মাধীন হইয়া পড়িলাম, তোমর সঙ্গে ত আর কোন সম্পর্ক রহিল না। এ যে নাস্তিক্য। এ যে দক্ষিণায়ন বৌদ্ধমত। কর্ম্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, পুরুষকারই কর্ম্মের কর্ত্তা;—এখানে এতদতিরিক্ত কর্ম্মাধিপের স্থান কোথায়? আর তাই যদি হয়, তবে কর্ম্ম যেমন পুরুষাধীন পুরুষও তেমনি কর্ম্মাধীন হইয়া পড়েন। কর্ম্ম পুরুষকে

বাঁধিতে চাহে, পুরুষ কর্ম্মকে রোধিতে চাহেন;—ইহাই তো, তাহা হইলে, সংসারের মর্ম্ম হয়। আর জীবন যদি এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই নামান্তর হয়, তবে সংগ্রামের জয়-পরাজয়ে দুঃখ, বেদনা ও অনুশোচনার অবসর থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুতাপের অবসর কোথায়? আর পুরুষ যখন একদিন না একদিন আপন কর্ম্মকে অভিভূত করিয়া, কর্ম্মচক্রের বহির্ভূতে, নির্বাণ লাভ করিবেই করিবে, তখন দুদিনের শক্তি পরীক্ষায় কর্ম্ম বা প্রবৃত্তি যদি তাহার উপরে জয়লাভই করে, তাতেই বা কি আসে যায়? আর এও তো সত্য যে পুরুষের ধর্ম্ম ও নিয়তি যেমন মুক্তি ও নির্ব্বাণ, কর্ম্মেরও তো ধর্ম্ম এবং নিয়তি সেইরূপ ক্ষয় ও বিলোপ। কর্ম্ম আপনি আপনাকে ক্ষয় করে। তাহা না করিলে পুরুষ কখন মুক্তিলাভ করিতে পারিত না; আর করিলেও, সে মুক্তি সার্ব্বজনীন হইত না, কেহ বা আকস্মিক ঘটনায় কখন কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারিত, অনেকে অনন্তকালই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিত। সংসারবন্ধন মোচন তবে শুদ্ধ আকস্মিক ঘটনার অধীন হইত, পুরুষেরও অধীন নহে, ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁহারও অধীন নহে। কিন্তু সংসারকে তো কখনও এমন নিরীশ্বর বলিয়া ভাবি নাই। আর যে ভাবেই দেখি না কেন, এ দীর্ঘ-জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, যাহা হারাইয়াছি, যাহা পাইয়াছি, তার এক কণাও আমি পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম না; পারিলেও, ঠাকুর, পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া এখন নিঃসংকোচে বলি,—এক কণাও তার পরিবর্ত্তিত করিতাম না। এই কারণেই জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, সকলের জন্য তোমাকে সরল হৃদয়ে ধন্যবাদ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের হিসাব নিকাশ

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—বাণপ্রস্থ অবলম্বনের সময় প্রায় সমুপস্থিত। এ সময়ে জীবনের একটা হিসাব নিকাশ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তাই এই আত্ম-জীবন কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে মনে, গোপনে, আত্মচিন্তাতে এ হিসাবনিকাশ করিলেই তো হয়, তাহা আবার কাগজে কলমে লিখার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ আর যে পারে পারুক, আমি কোন গভীর চিন্তাই মনে মনে করিতে পারিনা। প্রকাশের প্রয়াসেই আমার চিন্তা পরিস্ফুট হয়, অভিব্যক্তির চেষ্টাতেই আমার অন্তরের ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। আপনার মনোভাবকে যখন আপনি দেখিতে চাই, তখনই তাহাকে ভাষায় প্রকাশিত করিতে হয়। এই জন্যই লেখা ও বলা আমার প্রকৃতিগত হইয়া আছে। এই জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি যখনই যাহা লিখিয়াছি, বা যখনই যাহা বলিয়াছি, তার প্রথম পাঠক ও প্রথম শ্রোতা ত আমি নিজেই হইয়াছি। আমি সততই নিজের জ্ঞানলাভের জন্য, নিজের উদ্দীপনার জন্য, নিজের শিক্ষার জন্য, নিজের উন্নতির ও নিজের তৃপ্তির জন্য, লিখিয়াছি ও বলিয়াছি। এই কারণে অনেক সময় আমার লেখা ও বলা অপরের নিকট দুর্ব্বোধ্যও হইয়া গিয়াছে। আমি নিজের বোধগম্য হইবার জন্য যে ভাষা আবশ্যক হইয়াছে, তাহাই সতত ব্যবহার করিয়াছি, নিজে যাহা কিছু অধিগত করিয়াছি, তাহার বিবৃতি বা পুনরুক্তি করি নাই, প্রয়োজন হইলে, কেবল উল্লেখমাত্র করিয়াছি। এই জন্য যাঁহারা অন্য ভাবের ভাবুক, যাঁরা অন্য ধাপের বা ধাতের লোক, তাঁদের বোধগম্য করিবার কোন

প্রয়াস কোনদিন পাই নাই, এবং তাঁহাদের নিকট আমার কথা ও লেখা অনেক সময় জটিল ও অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

ফলতঃ আমার লেখাতে ও বলাতে সর্ব্বদাই আমি নিজেকে শিষ্যরূপে দেখিয়াছি। গুরু যে কে, তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। তবে ইহা অসংখ্যবার উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে, আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অনেক অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন। এজন্য লোকে যাহাকে আমার রচনা বা আমার উক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমি নিজেই চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি এবং নিজের লেখা পড়িতে পড়িতে নিজেই কত সময় বিস্ময়ে, আনন্দে ভগবৎ-কৃপা ও ভগবৎ-প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি।

মনোমধ্যে মনোভাব স্বপ্নের মত, বায়ুর মত, আকাশে তাড়িত বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড সকলের মত অস্পষ্ট, অস্পৃশ্য ও অগ্রাহ্য ও চঞ্চল হইয়া বিচরণ করে। এই মনোভাবকে যখন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি, তখন তাহা স্থির হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিতে থাকে। ভাষার আবরণে আবৃত হইতে যাইয়া যাহা অসম্বদ্ধ ছিল, তাহা সুসম্বদ্ধ ও ঘননিবিষ্ট হয়, যাহা একাকী ছিল, তাহা অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া, আপনার যথাযথ ওজন বুঝিয়া সংযত হয়; যাহা অসত্য তাহা পরিহৃত, যাহা সত্য তাহা যুক্তি-প্রতিষ্ঠ, ও যাহা সত্যাভাষ মাত্র ছিল, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাষার মুকুরেই সত্যের আত্মস্বরূপ ও চিন্তার নিজমূর্ত্তি পরিষ্কাররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। মনোগত চিন্তা ও ভাব যখন ভাষাতে অভিব্যক্ত হয়, তখনই আমরা তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করি। এই জন্য নিজ জীবনের স্বরূপ যদি দেখিতে হয়, তাহাকে ভাষায় অভিব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আত্মজীবন কাহিনী রচনার এক প্রয়োজন ইহা। এ প্রয়োজন আমার নিজস্ব। দর্পণান্তে জীব যেমন নিজ মূর্ত্তি দেখে, এই কহিনীতে

তেমনি আমি আমার এই অর্দ্ধশত বর্ষব্যাপী জীবনের স্বরূপ-ছবি দেখিতে পাইব, এই বাসনা হইতেই এই চেষ্টার জন্ম।

কিন্তু নিজের কথা লিখিতে লোকে সহজেই শঙ্কিত হয়। এ সঙ্কোচ স্বাভাবিক। যদি নিজের কথা সত্য সত্য নিজেরই কথা বলিয়া ভাবিতাম, তবে আমিও কখনও এ কাহিনী লিখিতে বসিতাম না। কিন্তু নিজের কি আছে? নিজের কা'কে বলিব? এ জীবন কি আমার না তোমার? আমরা কি জীবনের কর্ত্তা? যদি তা হয়, তবে হয়ত আত্মকথা বিবৃতিতে দোষ আছে। কিন্তু সত্য তো এ নয়। এ জীবনের যদি কোন শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে, উজ্জ্বলরূপে লাভ করিবা থাকি, তাহা এই যে ইহা আমার নিজের নহে। এ জীবনের কর্ত্তা আর একজন, সে জন যেই হউক না কেন। তাঁরে চিনি এমন কথা বলি না। তাঁরে যে একবারেই চিনি নাই, এমনও বলিতে পারি না। এ জীবন তাঁরই খেলা। ইহার প্রভু, নিয়ন্তা, কর্ত্তা সকলি সে জন। এ জীবনের কথা নিজের কথা নয়, তাঁরই কথা।

আর যদি নিজেরই ভাবিতাম, তাহা হইলেও এ কাহিনী লিখিতে সঙ্কুচিত হইতাম না। এতদিন ধরিয়া এই জীবন ভোগ করিলাম, এত দীর্ঘকাল এই আমির সঙ্গে বসবাস করিলাম, কিন্তু তাকে ভাল করিয়া তো কখনো একবার প্রত্যক্ষ করিলাম না। সমাধিতে যে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, সাধুমুখে শুনিয়াছি, সে প্রত্যক্ষের কথা বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণভাবে যাকে দেখা বলে, সে ভাবেও তো নিজেকে কখনো ভাল করিয়া দেখিলাম না। এ জীবনে কত লোকের সঙ্গ করিলাম, কত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম, পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, কত লোককে দেখিলাম, বুঝিলাম, কত লোকের জীবনগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কত সুখ, কত শিক্ষা লাভ করিলাম; আর কেবল নিজের জীবনই দেখিলাম না, পড়িলাম না, ইহার যে শিক্ষা

তাহাই ভাল করিয়া ধরিলাম না। এও কি ক্ষোভের কথা নহে ? আর এ জীবনকে যদি দেখিতে হয়, তবে ইহাকে বাহিরে, চক্ষের উপরে, অপরের জীবনের মত ধরিতে হইবে। ইহার জ্ঞানলাভ করিতে গেলে, ইহাকে ধ্যানের বিষয় করিতে হইবে। আর তাহা করিতে গেলেই, ইহার যথাযথ ছবি আঁকিয়া নিজের মনের সম্মুখে স্থাপন করা প্রয়োজন। আপনাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া না ধরিলে, কখনই আপনাকে আপনার জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। জ্ঞেয়কে জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ করিয়াই জ্ঞানের সূত্রপাত হয়। এই জন্যও নিজেকে সত্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে, জানিতে গেলে আপনার জীবনের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপনার সমক্ষে ধারণ করা আবশ্যক। সকল জ্ঞানের সেরা জ্ঞান আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, আত্মজীবন-কাহিনী রচনা করিয়া, ধ্যানসহকারে তাহা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। ইহাতে লজ্জার বা সঙ্কোচের বিষয় কি আছে ?

এইরূপভাবে আপনার জীবনী রচনার চেষ্টাতে আরো ফল আছে। তাহাতে জীবন ফুটিয়া উঠে। এইরূপ প্রয়াসে যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ; যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা ব্যক্ত হয় ; যাহার মর্ম্ম অজ্ঞাত ছিল, তাহার অর্থ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা অভিব্যক্তির সাধারণ ধর্ম্ম। মনে মনে, গোপনে গোপনে, আত্মচিন্তাতে আপনাকে যতটা পরিষ্কাররূপে জানা যায়, ভাষায় সে চিন্তাকে যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতে পারিলে, তদপেক্ষা অনেক পরিষ্কার করিয়া আপনাকে দেখা যায়, ও বোঝা যায়। লোকে বলে, ভাষায় চিন্তা ও ভাব হাল্‌কা হইয়া পড়ে। কখনো কখনো হয়ত এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ অভিব্যক্তির চেষ্টা নহে, কিন্তু অভিব্যক্তার অক্ষমতা। আবার কখন কখন এমন বস্তুও আমাদের চিন্তার ও ভাবনার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, যাহা কেবলমাত্র প্রতিবোধগম্য, গভীর আত্মপ্রত্যয় লব্ধ, যাহাকে

প্রকাশ করিবার শক্তি ভাষা এখনো লাভ করিতে পারে নাই, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই স্বল্পবিস্তর পরিমাণে এইরূপ কোন কোন গভীরতম অভিজ্ঞতা থাকে, যাহা কথায় ব্যক্ত হয় না। এসকল কথা জীবনের অতিশয় অন্তরঙ্গ কথা। তার চিত্র কোন পটে উঠে না। সে তত্ত্ব প্রকাশ করে, এমন জ্যোতি জগতে নাই।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সে গভীর আত্মতত্ত্ব, যেখানে জীব-ব্রহ্ম একীভূত হইয়া বাস করিতেছেন, যে আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকাশ করে,—তাহা বর্ণনা করে সাধ্য কার? প্রাকৃতজনের তাহা সাধ্যাতীত। কিন্তু জীবন যাহাকে বলি, তাহা এ গভীর আত্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার বাহিরে, তাহার বহিরঙ্গরূপেই, বিরাজ করে। কেবল ইহারই চিত্রাঙ্কণ, ইহারই বর্ণনা, ইহারই প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি সম্ভবপর।

প্রত্যেক জীবনেই, সমান্তরাল ভাবে, নিয়ত দুই লীলাতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। এক অন্তরঙ্গ লীলা, আর এক বহিরঙ্গ লীলা। অন্তরঙ্গ লীলার উপরেই বহিরঙ্গ লীলা প্রতিষ্ঠিত সত্য, কিন্তু সে লীলা অনুভব করা, তাহা প্রত্যক্ষ করা সুকঠিন, বহু সাধন-সাপেক্ষ। এই অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে ভগবান আপনার জীব-প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য-লীলাতে নিযুক্ত। এই জীব-প্রকৃতি তাঁর লীলার নিত্য সহচরী। আমরা সচরাচর যাহাকে আমি আমি বলি, তাহা এই জীব-প্রকৃতির অংশ, তারই প্রতিবিম্ব বটে; কিন্তু তদপেক্ষা অনেক নিম্ন ভূমিতে বাস করিতেছে।

অজামেকং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানং সরূপাম।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজেঽন্যঃ॥

উপনিষদ এখানে তিন নিত্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এক প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তম গুণান্বিতা,—লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং—দ্বিতীয় জীবাত্মা যিনি এই প্রকৃতি দ্বারা সেবিত হইয়া তাহাকে ভোগ করেন; জুষমাণোঽনুশেতে; আর তৃতীয় পরমাত্মা যিনি ভোক্তা ও ভোগ্য এই উভয় হইতে পৃথক্ হইয়া, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাম, ইহাদেরই সঙ্গে নিয়ত বাস করিতেছেন।

পরবর্ত্তী শ্রুতিতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তপরয়ো নঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য
নশ্নন্নন্যোহ ভিচাবশীতি॥

দুই পাখী, পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ও সখ্যবদ্ধ হইয়া এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। ইহার একটী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, অপরটি আপনি অভুক্ত থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র। এই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কখন বিচ্ছেদ হয় না—ইহারা উভয়ে "সযুক্তা" হইয়া আছেন। আর ইঁহাদের প্রেমলীলারও বিরাম হয় না—ইঁহারা পরস্পরের সঙ্গে নিত্য সখ্যবদ্ধ। এই যুক্ত ও সখ্য অবস্থা সজ্ঞান অবস্থা। জীবাত্মা যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তবে যোগের ব্যাঘাত হয়, প্রেমবন্ধনও ছিন্ন হইয়া যায়।

এক শাখী পরে, দু বিহগবরে,
সুখে বসবাস করে,
(উভে) উভয়ের সখা, প্রেমে মাখামাখা,
দোঁহে দোহাঁরে নিরখে ;—

ইহা আমরা যাহাকে সংসারী, মোহান্ধ, জীব বলি, তাহার কথা নহে। ইহা নিত্যধামের নিত্যলীলার কথা। এ জীব-তত্ত্ব অহঙ্কার-তত্ত্বের উপরে।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ভগবানের সর্ব্ববিধ নিকৃষ্ট প্রকৃতি মধ্যে আমাদের মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার এ সকল অন্যতম। এ সকল অপরা প্রকৃতি। অন্যা পরা প্রকৃতি তাঁর আছে—তাহাই জীবাত্মা

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

জীবভূতা সেই শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে।

এই জীব-প্রকৃতি, ভগবানের ন্যায়, স্বয়ং সিদ্ধা, নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সম্পন্না। ইহার মোহ নাই, মায়া নাই। ইহা ভগবল্লীলার নিত্য সহচরী। অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্য্যন্ত মায়াধীন, প্রকৃত জীব-তত্ত্ব মায়াতীত। এই জন্যই শ্রুতিতে জীবের মুক্তিকে নিত্যসিদ্ধাবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তি জন্য-বস্তু নহে। ক্রিয়া দ্বারা, সাধনা দ্বারা তাহা কেহ প্রাপ্ত হয় না। সাধনা দ্বারা কেবল যে মোহেতে জীবের এই নিত্যসিদ্ধ মুক্তভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তাহা অপসৃত হয় মাত্র। ঠুলিতে চক্ষু ঢাকিয়া রাখিলে, জীব দৃশ্য বস্তু দেখে না সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার চক্ষুর স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টিশক্তি কখন বিলুপ্ত হয় না। আর এই ঠুলি খুলিয়া দিলে চক্ষু আবরণমুক্ত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর

অভিনব দৃষ্টিশক্তি হয় না। সেইরূপ মায়াবৃত-জ্ঞান জীব আপনার স্বরূপ দেখে না, তাই বন্ধ-দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু এই আবরণে সে স্বরূপ কখন নষ্ট হয় না। মায়ার ঠুলি অপসৃত হইলেই, আবরণ-মুক্ত হইয়া সে তাহার নিত্যসিদ্ধাবস্থা উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করে। ইহাই জীব-প্রকৃতি। এই জীব-তত্ত্ব অহঙ্কার-তত্ত্বের উপরে ও অতীতে। এই জীব-তত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাস করিতেছে।

আর আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই জীব-ভগবানের নিত্যলীলা নিয়ত অভিনীত হইতেছে। এইখানেই এই বিচ্ছিন্ন জীবনের একত্ব ও প্রতিষ্ঠা। ঐ লীলাতেই জীবনের বিবিধ সম্বন্ধসকলের উৎপত্তি ও পরিণতি। ঐ নিত্য, ঐ তুরীয় ধামে যে প্রেমের, জ্ঞানের, পুণ্যের, আদান প্রদান নিয়ত চলিতেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ও উপরিস্থ বুদ্বুদের ন্যায় আমাদের জীবনের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যাদি ফুটিয়া উঠিতেছে। সে লীলা নিগূঢ়। তাহা বুদ্ধির অগম্য। তাহার বর্ণনা তো দূরের কথা, ধ্যান ও ধারণাও বহুভাগ্যবলে কচিৎ কখন সাধুজনের পক্ষে সম্ভব হইলেও, প্রাকৃত জনের অধিকারের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। সে তত্ত্ব ব্যক্ত করিবে কে? সে চিত্র অঙ্কন করে সাধ্য কার? সেই নিগূঢ় তত্ত্বের আভাস পাইয়াই শ্রুতি বলিতেছেন,

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

এ অন্তরঙ্গ লীলাতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ হয় না; ব্যক্ত করিবার প্রয়াসেই, বোধ হয়, তাহা লঘু হইয়া পড়ে। সে লীলা বর্ণনা করিবার অধিকার আমার নাই, তাহা অনুভব মাত্র যদি করিতে পারি, তাহা হইলেই

কৃতকৃতার্থ হইয়া যাই। সে নিত্য বৈকুণ্ঠ-ধামে ভক্তি-বলেই ভক্তেরা প্রবেশ করিয়া থাকেন।

বহুনাং জন্মনামান্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

সে নিখিল-রসামৃত-পূরিত, চিরবসন্ত-সেবিত, ভক্তমধুপকুল প্রেম-স্তুতিগীতগুঞ্জিত, লীলাতরঙ্গোচ্ছ্বসিত, নিত্যমলয়বীজিত, চিদালোকোদ্ভাসিত, অপ্রাকৃত, নিত্য, তুরীয় লীলার কথা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। সে তত্ত্বের সামান্য আভাস পরম ভক্তজনের জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়; প্রাকৃতজনের সে তত্ত্ব বর্ণনায় অধিকার নাই, সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু ঐ লীলা ছাড়িয়া এই সংসার আবর্ত্তেরই বা অর্থ পাই কোথায়? প্রদোষ সময়ের আলোক অন্ধকারের যে অপূর্ব্ব মিলন তার অর্থ ও মীমাংসা যেমন দিবসের নিরবছিন্ন আলোকরাশির মধ্যে, সেইরূপ মর জীবনের জ্ঞান ও অজ্ঞানের, চৈতন্য ও মোহের যে অত্যদ্ভুত সংমিশ্রণ, তারও অর্থ ও মীমাংসা, ঐ নিত্য, ঐ অমর, ঐ চিদালোক-সমুজ্জ্বল বৈকুণ্ঠধামে। এ সংসারের অনিত্যতা সেই নিত্য সত্যকেই আপনার কারণ ও আশ্রয়রূপে নিয়ত নির্দ্দেশ করিতেছে। জীবের চিরঅতৃপ্ত রসলিপ্সা নিয়ত সেই নিখিল রসতত্ত্বকেই আপনার উদ্ভব ও পরিতৃপ্তি-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। সংসারের যে সকল সম্বন্ধ আমাদিগকে আবদ্ধ করিতেছে, এই সকল বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, মাধুর্য্যের কি কোন অর্থ নাই? জন্ম মরণের অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই কি এ সকল সম্বন্ধের খেলা ফুরাইয়া যায়? তবে এ শোক, এ ক্রন্দন, এ নিরাশাই তো জীবের চিরবিহিত নিয়তি। সংসারের তবে অর্থ কি রহিল? এই যে অতৃপ্ত বাসনা, ইহারই বা সার্থকতা হইল কোথায়? এই যে অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা, এই যে চির-জ্বলন্ত প্রেমলিপ্সা, এই যে আত্যন্তিক সেবা-প্রবৃত্তি, এই যে অতুল-অতৃপ্ত করুণা,—যাহা সংসারে কেবল মাত্র

উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু কদাপি পরিতৃপ্ত হয় না, হইতে পারে না, ইহার কি কোনোই অর্থ নাই? যদি না থাকে, তবে সংসারের কোনোই সার্থকতা কল্পনা করাও সম্ভব হয় না, জ্ঞান ধারণা করাতো দূরের কথা। তাহা হইলে এ সংসার কোন একান্ত ক্রূরমতি ব্যক্তির খেলারূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অন্তরালে, ইহার মূলে, অনন্ত মঙ্গল-শক্তি বা ইচ্ছা কল্পনা করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। তবে আস্তিক্যের আশ্রয়, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ভক্তির অবলম্বন, জীবনের সার্থকতা, মৃত্যুর শিক্ষা, সকলই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। আর এই সংসারচক্রের পশ্চাতে, ইহার উদ্ভব, ইহার আশ্রয়, ইহার প্রেরণা ও ইহার পরিণতিরূপে এক নিত্য, তুরীয়, অপ্রাকৃত লীলারঙ্গের প্রতিষ্ঠা কর, দেখিবে সকলই সত্য ও সার্থক হইয়া উঠে।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিংল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে।
তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥

এই যে নিয়তপারণামী সংসাররূপ সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষ, ইহার মূল ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে, ইহার শাখাসকল নিম্নগামী, জীবজগতাভিমুখী। এই সংসারবৃক্ষের যে মূল, তাহাই শুক্র বা জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়। তাহাতেই লোকসকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাহার অতীতে কিছুই নাই।

পুনশ্চ ভগবদ্গীতায়—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥

হে অর্জ্জুন! এই যে সংসার দেখিতেছ, ইহার রূপ, ইহার অন্ত, ইহার আদি, এবং ইহার আশ্রয় জীবের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। কারণ ইহার মূল উর্দ্ধে সংসারাতীতে মায়াতীত পুরুষোত্তমে। অধোদেশে, মায়াময়ী সৃষ্টিতে ইহার শাখাসকল প্রসৃত হইয়াছে। ইহা প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া অব্যয় পদবাচ্য হইয়াছে। কর্ম্মফল বিধানের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়া জীবকুলকে আশ্রয় দান করিতেছে বলিয়া, বেদসকল এই সনাতন সংসার-বৃক্ষের পর্ণস্বরূপে কল্পিত হয়। দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই বৃক্ষের উর্দ্ধ ও অধোগামী শাখা। সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণের দ্বারা শোষিত হইয়া, এই সকল শাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রূপরসগন্ধাদি ইহার প্রবালস্থানীয়া। অধোদেশে মনুষ্যলোকে এই সনাতন সংসার-বৃক্ষের শিকড়সকল ভোগবাসনা প্রভৃতিরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে।

পরমপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান এই সংসারচক্রের নিয়ন্তা। কিন্তু পুরুষ তো কখন একাকী বাস করেন না। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রকৃতি সহবাসে, প্রকৃতি সান্নিধ্যেই তাঁহার পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত। এই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তারই মধ্যে ভগবানের পরম পুরুষত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি আপনার জ্ঞানের ও আনন্দের আয়োজন করিতেছেন। এই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া, তাহার সঙ্গে নিত্যলীলাতে নিযুক্ত থাকিয়াই তিনি আপনি আপনাকে আত্মা-রূপে জানিতেছেন ও সম্ভোগ করিতেছেন। এই নিত্য, তুরীয় লীলা ব্যতীত পুরুষস্বরূপের আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। আর এই যে সংসারচক্র, ইহারও আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা ও

সার্থকতা ঐ তুরীয়, ঐ নিত্য লীলাতেই অন্বেষণ করিতে হয়। এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন। এই সংসার পুরুষ-প্রকৃতির প্রকট লীলা। এখানে পরমপুরুষ কারণব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডে, অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে জীবের অন্তরে, আর লীলাময় ভগবানরূপে মনুষ্যলোকে, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, সখাসখী, দাসদাসী, প্রভু ভর্ত্তা, পতি পত্নী, নায়ক বা নায়িকাগণের দেহ আশ্রয় করিয়া, সেই নিত্যধামের নিত্যলীলার রস মাধুর্য্যের বিকাশ করিয়া, কালের সীমাবেষ্টিত জগত রঙ্গমঞ্চে, আপনার অপ্রাকৃত বা তুরীয় লীলারই প্রাকৃত ও প্রকট অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাই সংসারের অর্থ। ইহাতেই জীবের অশন-পিপাসার, সুখদুঃখের, আশা-নিরাশার, মিলন-বিচ্ছেদের, অনুরাগ-বিরাগের, জীবন-মৃত্যুর ও সকলের সার্থকতা।

আর এই জীবন যদি স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক ভাগবতী লীলার অভিনয়ক্ষেত্র রূপে রচিত হইয়া থাকে, তবে ইহার কর্ত্তা তো আর আমি রহিলাম না। এখানে যে তিনিই নটরূপে সমুদয় ঘটনা ও সম্বন্ধকে আত্ম-প্রয়োজনে, যথেপ্সীতভাবে, যথোপযুক্ত প্রকারে সংযোজিত ও বিয়োজিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। জীবনের কাহিনী তবে আর জীবের আত্মকাহিনী রহিল কৈ? ইহা যে ভাগবতী লীলার অপূর্ব্ব কাহিনীতে পরিণত হইয়া গেল। এ কাহিনী বর্ণনায় আর অভিমানের বা সঙ্কোচের অবসর রহিল কোথায়?

সকল সময়ে আপনার জীবন রঙ্গমঞ্চে ভগবানকে নটেশরূপে দেখিতে পাই না, সত্য। আর তারই জন্য এ সংসারে এত ক্লেশ, এত শোক, এত তাপ সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু এ জীবনের বিচিত্রতা পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত, ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষ করিবার অন্য উপায়ই বা আর কি আছে? মানসপটে জীবনের বিবিধ অঙ্কসকলকে প্রতিফলিত না

করিলে, তাহার অভ্যন্তরস্থ ভাগবতী লীলার সাক্ষাৎকারই বা হয় কিরূপে? উপস্থিত ঘটনাবলী আমাদিগকে সুখদুঃখের তাড়নায় এতই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে, যে তাহার মধ্যে ভাগবতী লীলা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন এ সকল অতীতের স্মৃতিতে স্থৈর্য্য ও শান্তিলাভ করিতে থাকে, তখন ইহাদের নিগূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় ধীরে ধীরে, ঊষার উদ্ভিন্ন আলোকের মত ফুটিতে আরম্ভ করে। তখনই এ সকল বিচিত্রতার মধ্যে জীবনের একত্ব অনুভব করিয়া আমরা বিস্ময়ে, আনন্দে নির্ব্বাক্ হইয়া যাই। এই সকল পুণ্যস্মৃতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিলেই তাহার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ভগবদ্‌করুণা আমরা অনেক সময় হয়ত দেখিতে পাই; না দেখিলেও, তাহা কল্পনা করিয়াই আশ্বস্ত বা শান্ত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। গভীর আনন্দে, বা গভীর শোকের মধ্যে; নবজীবনের অপূর্ব্ব অঙ্কুরোদ্গমে কিম্বা মৃত্যুর ঘননিবিড় অন্ধকারের মধ্যে, প্রাকৃতজনের ভাগ্যেও ভগবদ্দর্শন লাভ না হউক, ভগবদ্‌শক্তির অনুভূতি স্বল্পবিস্তর হইয়া থাকে। আর সচরাচর লোকে জীবনের এই সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেই ভগবানের প্রেমের ও বিধাতৃত্বের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার পুণ্যস্মৃতি প্রাণমধ্যে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতি দিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আশা ও নিরাশা, সফলতা ও নিষ্ফলতার মধ্যেও যে সেই একই শক্তি, একই প্রেম, একই মঙ্গল সঙ্কল্প আপনাকে আপনি ফুটাইয়া তুলিতেছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহি না, কচিৎ যদি ভগবৎ-প্রসাদে তাহার আভাস প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও তাহাতে সরল শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না। ভাগবতী

লীলাকে এতটা সস্তা করিয়া তুলিতে আমাদের দুর্ব্বল বিশ্বাসের সাহসে কিছুতেই কুলায় না।

আর, প্রতি দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ও ব্যবস্থার মধ্যে ভগবানের লীলা যদি দেখিতে হয়, তবে এগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে চলিবে না। জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যে মৃত্যুরই পৈশাচনৃত্য দেখিতে পাই, তাহার কোলাহলের ভিতরে নরকপালগণের অট্টহাস্যই কেবল শুনিতে পাই,—অমৃতের সন্ধান বা ভগবৎ বেণুধ্বনি কিছুই তাহার মধ্যে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

এখানে বহুত্ব কিছুই নাই, ইহা একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে যে বহুতর প্রত্যক্ষ করে, মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুতেই কেবল গমন করিয়া থাকে। জীবনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেখিলে চলিবে না। জীবনকে এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে, তাহার গতি ও নিয়তি, একত্ব ও মহত্ব, নিগূঢ়ত্ব ও দেবত্ব, কিছুই দেখা যায় না। এই মুহূর্ত্তকে যখন পূর্ব্বাপর মুহূর্ত্তসকলের সঙ্গে সংযুক্ত করি, অগুকার বিধানকে যখন গত কল্যকার বিধানের ভিতর দিয়া দেখি,—ইহাকে যখন আজন্মব্যাপী সমুদয় ঘটনাবলীর সঙ্গে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিতে পারি, তখনই জীবনের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হই। তখনই দেখি আজি যাহাকে সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহা গত কল্যকার দুঃখ যাতনারই ফল; আর আজি দুঃখবোধে যাহা হইতে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা কেবল জীবনক্ষেত্রকে কঠোর হলচালনা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া কল্যকার মঙ্গল ও মুক্তির বীজ বপনের উপযোগী করিতেছে।

ফলতঃ জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে যতটা সম্ভব, একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেখিলেই কেবল

তাহাতে সত্যভাবে ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। আর এইভাবে যখন জীবনের কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন ইহা ভগবদুপাসনার অঙ্গ হইয়া পড়ে।

ভক্তিশাস্ত্রে ভগবদ্ স্মরণের উপদেশ আছে। এ স্মরণ কাহাকে বলে? স্মরণ বলিতে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বোঝায়। যাহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই, তাঁহাকে স্মরণ করিব কেমন করিয়া? শ্রুত বিষয়ের স্মৃতি হয়। ভগবল্লীলা পুরাণ ইতিহাসে যাহা শোনা গিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তিকে লোকে সচরাচর স্মরণ বলিয়া মনে করে। ইহাও স্মরণ সত্য। কিন্তু আমার নিজ জীবনে যদি ভগবল্লীলা না দেখিলাম বা না বুঝিলাম, তবে এ স্মৃতিতে আমার লাভ কি? বন্ধ্যার পুত্রস্নেহের ন্যায় ইহা যে কেবল কল্পিত, কেবল শব্দমাত্রে প্রতিষ্ঠিত; সত্য বা বস্তুতন্ত্র নহে। রাম-বনবাসে জননী কৌশল্যার গভীর মর্ম্মবেদনা বুঝেন কেবল পুত্রবতী রমণী, অপুত্রা যে সে ইহার কি জানে? পুরাণ ইতিহাসের স্মৃতি যদি আমার আত্মস্মৃতিকে জাগাইয়া দেয়, তবেই কেবল তাহাদের সাহায্যে আমার ভগবৎ-স্মরণ সম্ভব হয়, অন্যথা নহে। পুরাণেতিহাসে ভগবল্লীলা কাহিনী শ্রবণ করা গৌণ স্মরণ, মুখ্য স্মরণ নিজ জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীতে ভগবানের প্রেম ও প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা। আত্মজীবন-কাহিনী ভক্তি-ভরে অধ্যয়ন ধ্যান করাই প্রকৃত স্মরণ। ইহা ভক্তি-সাধনার মুখ্য অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত।

আর এইভাবে যদি আত্ম-জীবনচরিত রচিত হয়, তাহা হইলে, ইহা ভগবদুপাসনার অঙ্গ হইয়া যায়। ভগবদ্‌গুণ বর্ণনায় যদি অপরাধ না হয়, এরূপ আত্মচরিত রচনায় তবে লোকে সঙ্কুচিত হইবে কেন?

এইরূপ আত্মচরিত কথনের প্রয়োজন দুই, এক অন্তরঙ্গ, অপর বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ প্রয়োজন ভগবল্লীলারস আস্বাদন, বহিরঙ্গ প্রয়োজন লোকমণ্ডলী মধ্যে সে নিখিল লীলারহস্য প্রচার।

কিন্তু প্রাকৃত জনের জীবন-কাহিনী শুনিবে কে? লোকে মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাই আগ্রহ সহকারে পাঠ করে, তাহাদের জীবনে ও চরিত্রেই কেবল শিক্ষনীয় বিষয় আছে মনে করে। সামান্য লোকের জীবনের অকিঞ্চিৎকর কথা শুনিয়া লাভ কি? আজি পর্য্যন্ত জীবন-চরিত যে আদর্শে রচিত ও যে ভাবে পঠিত হয়, তাহাতে এ আপত্তি উঠে বটে। কিন্তু এ আদর্শই কি ঠিক?

ফলতঃ মহৎজীবনের আখ্যায়িকায় ইতর পাঠকবর্গের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে অনেক সময় ক্ষুদ্রচেতা পাঠকের চিন্তা ও কল্পনাকে আপনার জীবন ও অধিকারের সত্য হইতে বিচলিত করিয়া, এক অলীক ও অনধিকার পথে পরিচালিত করিয়া থাকে। এ সকল মহৎ জীবনের আলোচনায় দুর্ব্বল লোককে স্বধর্ম্মচ্যুত ও ভয়াবহ পরধর্ম্ম পথে পরিচালিত করিয়া উভয়ভ্রষ্ট করিয়া তোলে। ইহারা আপনার ক্ষুদ্রতাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া তাহারই মধ্যে আপনার নিজস্ব মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও পারে না, আর লোকোত্তর চরিতের যে বিশালত্ব ও ঔদার্য্য তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মহৎজীবনের মোহিনী কল্পনায় ইহাদের জীবন ও চরিত্র মহৎ না হইয়া অনেক সময় লঘু ও আকাশমার্গচারী হইয়া পড়ে। আমি চাই আমার মত যারা, ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেই যাহারা আত্মহারা ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাদের অভিজ্ঞতা কি ইহাই জানিতে। তারা এই দুর্ব্বলতার মধ্য হইতে প্রতিদিন যদি বল সংগ্রহ করিতেছে শুনি, এই সামান্য ভাবনার ভারই সোজাভাবে বহন করিতেছে বুঝি, প্রতিদিন শতবার বিষয়জালে আবদ্ধ হইয়া, আবার সেই জাল কাটিয়া বাহির হইতেছে দেখি,—পাপের মধ্যেই পুণ্য, নিরাশার মধ্যেই আশা, দুঃখের মধ্যেই সুখ, ভীরুতার মধ্যেই সাহস লাভ করিতেছে, এ যদি ভাল করিয়া ধরিতে পারি, তবে আমারও বুকে বল থাকে, চিত্তে ধৈর্য্য

আসে, মনে সাহস আসে, জীবনে আশা আসে। এই শিক্ষাই, এই প্রেরণাই, এই প্রবোধই আমি চাহি। বামন কি করিয়া আপনার আয়ত্ত ফল আহরণ করে, আমি তাহাই জানিতে চাহি, সে শিক্ষারই আমার আবশ্যক, প্রাংশুজনে কি করিয়া আপনার জীবনের ঈপ্সিত লাভ করেন ইহা জানিয়া আমার কি লাভ?

চতুর্থ চিন্তা

প্রথম অধ্যায়

আভাস ও আকাঙ্ক্ষা

হে দেব! তোমার তত্ত্ব এ অধমের নিকট কবে সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবে বল। নিরাকারে ভক্তি হয় না। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে যখন তত্ত্ববস্তুকে দেখি, তখনও মন ছড়াইয়া যায়, ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। পুরুষরূপে যে আমি তোমার ভজনা করিতে চাই। সে পুরুষরূপ তোমার কোথায়? তাহাই আমার নিকট প্রকাশিত কর। তুমি আগ্যাশক্তি ইহা বেশ বুঝি। তুমি করণ-কারণ বেশ ধরিতে পারি। বিশ্বের আশ্রয় তোমার অনন্ত জ্ঞান ইহাও যেন ধরিতে পারি! কিন্তু এ সকলই তোমাকে দূরে, অতি দূরে রাখে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, এতটা মনে হয় যেন ধরিতে পারা যায়। তুমি জগতে পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্য, তুমিই জ্ঞানজালে বিশ্বের বিচিত্রতাকে ধরিয়া আছে, ফলে এই সত্য ও জ্ঞান অনাদি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, বিভু ও মহান্, তুমি ব্রহ্ম, ইহা যেন বুদ্ধিতে কিয়ৎপরিমাণে ধারণা সম্ভব। কিন্তু তুমি আনন্দহেতু, তুমি ভগবান, তুমি আমার সঙ্গে নিত্য লীলা করিতেছ, তুমি পুরুষ, আমি তোমার প্রকৃতি, তুমি নিয়ত দিতেছ আমি নিতেছি, আবার আমি দিতেছি তুমি নিতেছ। এই মধুর আদানপ্রদানের সমন্ধ তোমার সঙ্গে আমার,—ইহা বুদ্ধিতে বুঝিলেও ঠিক ধ্যান করিতে পারি না। তোমাকে আংশিকভাবে নানা আধারে ধ্যান করিতে পারি। পিতার আধারে,—পিতৃদেবের দেহে ও চরিত্রে ও কার্য্যে এবং নিজের অন্তরস্থ যে পিতৃভাব যাহা সন্তানকে আশ্রয় করিয়া

এ অধমের মধ্যেও প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে তোমাকে পিতারূপে ধ্যান করিতে পারি। মাতৃ-আধারে আমার মাতাঠাকুরাণীর দেহে ও চরিত্রে ও আমার সন্তানগণের মাতৃদেহে ও মাতৃভাবে তোমার মাতৃত্ব ধ্যান করিতে পারি। সখা-দেহে তোমার সখিত্ব, প্রভুদেহে তোমার প্রভুত্ব, পুত্র-কন্যার মধ্যে তোমার পুত্রত্ব ও কন্যাত্ব, মানুষের মধ্যে তোমার মানুষী তনু, এ সকল খণ্ড খণ্ড ভাবে ধ্যান করা সম্ভব। মাঝে মাঝে এ ধ্যান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি। কিন্তু দেব! তুমি যে একাধারে পিতামাতা সকলই, পরমপুরুষরূপে তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ,—তুমি অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া আমাকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়া, আবার আমার বাহিরে পরম-অনাদি-অনন্ত-পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছ। তুমি অজর-অমর-নিত্য-নিরাময়-চিদানন্দ-সদানন্দ-ভূমা-ষড়ৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, ত্রিগুণাতীত পরম দিব্য পুরুষ—এই সত্য ধ্যানে আনিতে পারি না। গুরুদেহে ও শ্রীগুরুচরিত্রে তোমাকে ধরিতে যাই—সেই দেহের ও সে জীবনের প্রাকৃতভাব আসিয়া দৃষ্টিকে আবৃত করে, চিত্তে সন্দেহ জাগাইয়া দেয়, সেখানেও তোমাকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। ঠাকুর, একদিন নিরাকারের কল্পিত ভজনায় আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতাম। ব্যাপকতা ভাবে তোমার ধ্যান করিয়া, নিজের প্রাণে যে আনন্দ পাইতাম, তারই মধ্যে তোমার অরূপ-মোহিনীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। সে আনন্দরস—ভোর চক্ষে জড় ও জীবকে দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এখন আর তাহাতে প্রাণ জুড়ায় না যে প্রভো! এখন তোমাকে আরো নিকটে, আরো ঘনভাবে দেখিতে চাই। তোমার কি কোন রূপ নাই? তবে বিশ্বের এ রূপের ঢেউ কোথা হইতে আইসে? তোমার কি কোন দেহ নাই? তবে বিদেহী আত্মা তোমাকে সম্ভোগ করে কি-রূপে? তুমি যদি একান্ত নিরাকার হও, তবে বেদান্তের সিদ্ধান্তই তো সত্য হইয়া যায়। তবে ব্রহ্মানন্দ

প্রগাঢ় সুষুপ্তিতুল্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যেখানে জ্ঞাতা নাই জ্ঞেয় নাই, কেবলই জ্ঞান আছে, ভোক্তা নাই ভোগ্য নাই, কেবল সম্ভোগ কেবল আনন্দ আছে,—সে তো সুষুপ্তির অবস্থা। ইহাই তো নিরাকারের মীমাংসা। কৈবল্য বা লয়মুক্তিই যে নিরাকার-তত্ত্বের পরিণাম। তবে তো মায়াবাদই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাহা যদি সৎ সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে, মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, শঙ্কর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে, আমাদের ব্রাহ্ম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও তো তাহাই সত্য হয়ঃ—

"ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্,
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার;
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।

এই চিদ্বিভূতি ও এই চিদ্‌দেহ, এই চিদ্‌রূপ কি প্রভো! তাই যে দেখিবার জন্য প্রাণ সময় সময় লালায়িত হইয়া উঠে। এই রূপ প্রকাশিত কর প্রভো! হে গুরো, পরম দয়াল তুমি, দয়াপরবশ হইয়া, এই অধমকে ঐ চিৎরূপের নিকট লইয়া যাও। সকল সন্দেহ দূর কর গুরো! তোমার চরণ ভিন্ন আর এ সাধন-ভজনহীনের গতি কি আছে বল। তর্কে এ বস্তু লাভ হয় না। গুরুকৃপাই এ পথে সম্বল, শুনিয়াছি। গুরো! আকাঙ্ক্ষা যদি জন্মাইলে, তবে দয়াগুণে তাহা পূর্ণ কর। তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। তুমি ধন্য হে গুরো! তুমি ধন্য। তুমি ধন্য। তোমারই জয়। গুরো! তোমারই জয়, তোমারই জয়।

হে গুরো! আবার এক নূতন প্রভাতে তোমার চরণতলে আসিলাম। ঠাকুর, বড় সাধ যায় জীবনের সকল ভার তোমার চরণে অর্পণ করিয়া তোমার একান্ত অনুগত হইয়া বাকী ক'টা দিন কাটাই। কিন্তু, প্রভো! সময় থাকিতে এ সাধ কেন জন্মাইলে না? যখন সাক্ষাৎভাবে বাঁধিয়া চালাইতে পারিতে, তখন, কেন ঠাকুর, আমার অহঙ্কার অভিমানকে

জব্দ করিলে না? আমি যে অবিশ্বাসী, সহজে শ্রদ্ধা জন্মে না, সেই অপরাধেই কি তখন দখল কর নাই? এখনও যে আমার অবিশ্বাস পূরা আছে। তুমি তাহা জান। চাই তোমারে সকল দিতে, কিন্তু তুমিও যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছ, প্রত্যক্ষভাবে যে তোমায় পাই না। আর মনের ভিতর তোমায় ধরিতে যাই, সন্দেহ অমনি জাগে,—এ আমার কল্পনা, না—সত্য সত্য তোমার প্রেরণা? আমি, নিরাকারে যা কিছু সামান্য আস্থা ছিল, তাও হারাইয়াছি, আর চিদাকার যা—সত্যবস্তু তাহাও ধরিতে পারিতেছি না। আমি যে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। বুদ্ধি দিশাহারা হইতেছে। বিশ্বের চরম তত্ত্ব একান্ত নির্গুণ, নির্ব্বিশেষে নিরাকার নহে, এ জ্ঞান ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু সগুণ তত্ত্বও তো ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছি না। কখনও ভাবি, গুরুদেহে ও গুরু-চরিত্রেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রকাশিত, আবার দেহ নশ্বর, মানুষী ভাব সীমাবদ্ধ ও মায়াবদ্ধ,—তার মধ্যেই বা অবিনশ্বর, মায়াতীত, অনন্ত চৈতন্যের প্রকাশ কেমনে হয়, এ সন্দেহ জাগে। গুরুদেহ ও গুরুর মন ভগবদ্‌বিভূতি যদি বলি, তাহা হইলে, সূর্য্যাদির মত তাহা বিভূতির প্রকাশ হয়, স্বরূপ প্রকাশ তো হয় না। আর আমার প্রাণ চাহে সেই স্বরূপ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে। বিভূতিতে তাঁহাকে দেখিয়া স্থির-ভক্তি লাভ করা যায় না। স্বরূপ সাক্ষাৎ পাইলে পরে বিভূতি ভক্তি প্রেমের অবলম্বন ও উদ্দীপনা হয় বটে, কিন্তু তার আগে, বিভূতি কেবল মনকে শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সেই স্বরূপ কোথায় দেখিব? আপনার মধ্যে, তাহাও একান্ত অন্তর্মুখীণ (subjective) হইয়া যায়, তাহার বস্তুতন্ত্রতা (objectivity) তো থাকে না। আমি এ বড় বিষম গোলে পড়িয়াছি। কেহ নাই গুরো! এ সমস্যা আমারি মীমাংসা করিয়া দেয়। তুমি অন্তর দেখিতেছ, আরো কত কথা যে সেখানে আছে, তাহা তুমি জান। সে সকলের একটা ব্যবস্থা কর।

তোমার চরণে এই প্রার্থনা। জয় গুরো! তোমারই জয়। তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য।

হে গুরো! তোমার জয় হউক। তোমার নামের জয় হোক। তোমার প্রেমের জয় হোক। এই বন্ধনের শত দিবস তোমার কৃপায় কাটিল। কত ভয়, কত ভরসা, কত ভাবনা হয়েছিল, কি করিয়া এ ভাবে দিন যাবে, কিন্তু তোমার লীলা কে বুঝিবে প্রভো! তুমি কত নিগূঢ়ভাবে কত কি যে কর, তাহা তুমিই জান। অন্ধ আমি, তোমার লীলা না দেখিয়া কেবল ভয়ে ভয়ে মরি। দয়াল, যে দিন তোমার আশ্রয় দিয়াছ, সে দিন হইতেই যে আমাকে নিরাপদ করিয়াছ, সাধুমুখে এ কথা শুনিতাম। সদ্‌গুরুর আশ্রয় যে পাইয়াছে তার সকল ভয় কাটিয়াছে, সাধুরা বলেন। তাই কি সত্য, প্রভো? আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার—নিজের পানে তাকাইয়া তো কিছুই ভরসা পাই না। আর দীনবন্ধো! তোমার উপরেও তো একান্ত নির্ভর জন্মে না। যে তোমার পায়ে শ্রদ্ধাভরে সকল ভার অর্পণ করিতে পারে না, মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছ বলিয়া যে তোমার পরা-শক্তি ও জ্ঞানবলক্রিয়াতে একান্ত আস্থা রাখিতে ভয় পায়, পথ দেখে না, অবিপশ্চিৎ, মূঢ়, অন্ধ, অহঙ্কৃত, দেহাভিমানী, জ্ঞানাভিমানী যে, যে ভালমন্দ সত্যাসত্য বিচারও করিয়া উঠিতে পারে না, কোন মীমাং-সাতেই সুপ্রতিষ্ঠ হয় না, এমন লোককে তুমি কেমন করিয়া যে অভয় দান কর, তাহা জানিতাম না। এখনো জানি যে, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, গুরো! আর ভয় নাই —ইহলোকেও আর ভয় নাই, লোকান্তরেও নাই। সম্পদে তোমায় দেখি না সকল সময়, কিন্তু বিপদে, অসহায়তায়, নিরুপায় হইয়া যখন পড়ি, আপনার বলে যখন আর কুলায় না, আপনার হালে আর যখন পানি পায় না, তখন গুরো! তোমার চরণের দিকে দৃষ্টি পড়ে। এত

দিন অনির্দ্দেশ্য ভাবে, দেবতার বা বিধাতার প্রতি মন যাইত, তাহাকেই আশ্রয় করিতে চাহিত,—কিন্তু নিরাকারে অজ্ঞাতে, এ অবিশ্বাসীর অন্ততঃ শ্রদ্ধা স্থায়ী হয় না। এবারে, এই কারাগারের নির্জ্জনতার মধ্যে, এই ভীষণ অসহায়তার ভিতরে, প্রভো! তুমি তোমার চরণাশ্রয় একটু খুলিয়া দিলে, এই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল? তুমি জান, ঠাকুর, আমি এখন এই চাই, তোমার বিধানে যা হয়, তাই কর, কিন্তু ঐ আশ্রয় আমার আরো দৃঢ়, আরো সুস্পষ্ট, আরো প্রকাশ কর। ঐ চরণে মনকে দৃঢ় করিয়া বাঁধ।

তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধহ প্রেমের ফাঁস,

এম্‌নি করে' বাঁধ ঠাকুর, যেন আর পালাতে না পারি। আর যেন চিত্ত বিচলিত না হয়। তুমি আমার আশ্রয় তো আছই, প্রকাশিত হও কেবল। সাক্ষাৎ ভাবে, প্রত্যক্ষ প্রভু হইয়া জীবনকে চালাও, মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত কর, চিত্তকে শান্ত কর, কর্ম্মকে পরিচালিত কর, আর নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রাণে ফুটাইয়া চিরদিনের জন্য আমাকে তোমার করিয়া রাখ। গুরো! তোমারই জয়, তোমারই জয়, তোমারই জয় হউক। তুমি ধন্য! তোমার প্রেম ধন্য! তোমার লীলা ধন্য। তোমার দয়া ধন্য!

হে গুরো! এই নূতন দিনের সূচনায় তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমি আমাকে তোমার চরণাশ্রয় দান কর। তুমি আমার ভববন্ধন মোচন কর। তুমি আমাকে দয়া করিয়া সত্যবস্তু, তত্ত্ববস্তু, দেখাইয়া কৃতার্থ কর। আমি যেন, প্রভু, উভয়ভ্রষ্ট না হইয়া যাই। আমি কিছুই তো বুঝি না। কেবল, মাঝে মাঝে একটা লোভ অনুভব করি মাত্র। সে কি দেহবিকার, সে কি কেবল প্রাকৃত রূপ-লিপ্সা না সত্য সত্য তাহা তোমার লীলা, বুঝি না। নিখিলরসামৃত

মূর্ত্তি কথাটা কিছু দিন হইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহার সাধারণ ভাবও একটু আধটু মনে জাগিয়াছে কিছু দিন হইতে। এ ভিন্ন যে ভক্তির ও প্রেমের অন্য উপজীব্য নাই, ইহাও বুদ্ধিতে, জ্ঞানেতে, মনে হয় যেন বুঝিয়াছি একটু আধটু। কিন্তু এ বস্তু কি, এ তত্ত্ব কি, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছি না। চিদাকার কি, গুরো! আমায় বুঝাইবে কি? দেখিবার অধিকারী নহি, সে আব্দার করি না, সে হবে, যে দিন তোমার কৃপা হইবে সেদিন। আমি কিন্তু এ তত্ত্ব না বুঝিলে কেবল আঁধারে ঘুরিতেছি মনে হয়। "চিৎস্বরূপ আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার" প্রভো! আমি তো আযৌবন ইহাই করিয়া আসিয়াছি। এখন তাতে প্রাণ মানে না, জ্ঞানও তৃপ্ত হয় না যে? ভগবান্ যদি জ্ঞানময় হন, তবে তাঁহাকে আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ জানিতে হয়, তিনি তাহা জানিয়া থাকেন। ভগবৎ-জ্ঞান কখনো পরোক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়জ্ঞান, জীব যে ইন্দ্রিয় ভোগ করে, তার প্রত্যক্ষজ্ঞান ভগবানের তবে কেমন করিয়া হয়? এই জ্ঞানার্থে ভগবানেরও ইন্দ্রিয়বৃত্তি তো থাকা চাই। sensorium মন ষষ্ঠেন্দ্রিয়, যাহা চক্ষুকর্ণের যন্ত্রের চালক ও যাথক,—যাহা সাকার নহে,—তাহা ভগবানের থাকিবে না কেন? সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং —ইহারই বা অর্থ কি? এ সকল প্রশ্ন উঠে। ভগবানের চিৎস্বরূপ তবে আছে তো মনে হয়। সে রূপ নিরাকার নহে। সে রূপ আমাদেরই স্বরূপের নির্ম্মল সত্তা, আর কি হইতে পারে? তবেই তো অখিলরসামৃত মূর্ত্তি সত্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সে মূর্ত্তি চিৎদর্শনগ্রাহ্য চিৎবৃত্তি-ভোগ্য, তার সঙ্গে লীলা সম্ভব হয়। হে গুরো! এ সকল সন্দেহ মনে উঠিতেছে। তুমি দয়া করিয়া, এ সকল তত্ত্ব এ অধমের চিত্তে প্রকাশ করিবে কি? তোমার চরণে এই প্রার্থনা। তোমার জয় হউক গুরো! তোমারই জয় হউক, তোমারই জয় হউক! তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য!

হে গুরো, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, এই যে ভাব, এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই যে পিপাসা প্রাণে জন্মাইতেছে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি? এ কি আমার চিত্ত-বিকার, না আমার আজন্ম বা আযৌবন লালিত রূপলিপ্সারই একটা মায়িক খেলা? কেন প্রভো! ঐ রূপ দেখিবার জন্য প্রাণ অস্থির কখন কখন হয়? তোমার মুখে শুনিয়াছি সে অপ্রাকৃত রূপ, শাস্ত্রেও তাই পড়িয়াছি ও পড়িতেছি, কিন্তু আমার মানসপটে যাহা বুঝিতে চায়, তাহা তো ঠিক অপ্রাকৃত বলিতে সাহস হয় না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কি, গুরো! কোন ঐকান্তিক বিরোধ আছে? শাস্ত্রে তো সর্ব্বদাই দেখি প্রাকৃতকে অবলম্বনে অপ্রাকৃতকে নির্দ্দেশ করিয়াছে। এদিকে অপ্রাকৃত মদন নাম দিয়া, প্রাকৃত মদনের ভাবভঙ্গী ও রাগভাসের দ্বারাই যে সে অপ্রাকৃত লীলার ব্যাখ্যা করিয়াছে। কৃষ্ণের নিত্যরূপ কি প্রভো! সে কি মানুষিক রূপ নহে? সে কি দ্বিভুজ প্রেমময় মূর্ত্তি নহে? আর সে রূপ কি এই চাক্ষুষ রূপের সঙ্গে জড়িত নহে? যদি তাহা না হয়, তবে ঘনশ্যাম রূপ যা চক্ষে ভাসে, তা তো মানুষিক রূপেই দেখি ও শুনি। সে কি তবে মায়িক? এ কি তবে আমাদের ইন্দ্রিয়েরই কল্পনা? গুরো! আমি এর কিছুই বুঝিতেছি না, অথচ ঐ রূপেই যেন মন ক্রমে আকৃষ্ট হইতেছে। নিরাকারের উপাসনা আমার অসম্ভব করিয়া তুলিতেছ কেন? বহুদিন হইতেই একান্ত নিরাকারের ধারণার চেষ্টা ছাড়িয়াছি। তাহা তুমি জান। বিশ্বরূপে, বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। পিতৃরূপে পিতৃ-বিগ্রহে, তাঁর পিতৃত্ব, মাতৃদেহে তাঁর মাতৃত্ব, সখার দেহে তাঁর সখিত্ব, পুত্র কন্যার মধ্যে পুত্র-কন্যা-রূপে তাঁর বাৎসল্য, প্রভুর মধ্যে প্রভুদেহে তাঁকে প্রভু, আর দাসদাসীর মধ্যে তাঁর সেবা ও পরিচর্য্যা ও দাস্য এবং সতীদেহে ও পতিদেহে তাঁর মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ ও আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু, প্রভো! এ সকল যে নশ্বর, আজ আছে কাল থাকে•

না। এ সকলে তোমার পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, সখিত্ব, দাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, প্রকাশ হয় মাত্র, কিন্তু পর্য্যবসিত তো হয় না। এ সকল তো তাঁর নিত্য মূর্ত্তি, নিত্য আশ্রয়, নিত্য আধার ও নিত্য বিগ্রহ নহে, ও হইতে পারে না। আর যদি তোমার এ সকল রসের কোন নিত্য বিগ্রহ, নিত্য মূর্ত্তি, নিত্য আশ্রয় না থাকে, তবে এ সকল অনিত্যেরই বা প্রকাশ সম্ভবে কিসে? তাহা হইলে তো দেখি, এই বলিতে হয় যে তোমার রস জগতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠিতেছে। মানুষ যত জ্ঞানে, প্রেমে পুণ্যে, মঙ্গলে, উন্নত ও বিকশিত হইতেছে, ততই তুমিও জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে, মঙ্গলে ফুটিতেছ। আদৌ তুমি নির্গুণ, নিরাকার, অচেতনবৎ-চৈতন্যাশ্রিত—Pure Being,—জগৎ-বিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সজ্ঞান, সপ্রেম, সমঙ্গল হইয়া উঠিতেছ। বামমার্গী হিগে-লিয়ান সম্প্রদায়, শুনিয়াছি, এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ব্রাহ্ম সিদ্ধান্তও তো তবে ইহাই হয়। অন্ততঃ অন্য কোন সিদ্ধান্ত যৌক্তিক ও সুপ্রতিষ্ঠ ও সহজ হয় না। তাই, দেখিতেছি, গুরো! তুমি ক্রমে ক্রমে অপূর্ব্ব কৌশলে অধমকে কোন্ স্থানে আনিয়া ফেলিলে। আগেকার সব সত্য যে কল্পনাতে পরিণত হইতে চলিল। কিন্তু আমি বুঝি না কিছু। প্রকাশিত কর, গুরো! প্রকাশিত কর, সত্য প্রকাশিত কর। বস্তু প্রত্যক্ষ করাও। ধীরে ধীরে যে দিকে চালাইতেছ, সে পথ উজ্জ্বল কর। সকল সন্দেহ ভঞ্জন কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই মিনতি। জয় গুরো! জয় গুরো! জয় ধর্ম্মাবতারণ, জয় অদ্ভুতলীলাময় তুমি। তোমার চরণে সহস্র প্রণাম।

হে দীনদয়াল, তোমার কবে এ দয়া এ অধমের প্রতি হইবে যে আমি সত্য, সবল, প্রেম পাইয়া, সেই প্রেমে তোমার ভজনা করিতে পারিব। গুরো! তোমার নাম করি, তোমার চরণে আত্মসমর্পন করিতে চাই, নিজের স্বামিত্ব, আমিত্ব তোমাকে দিয়া, তোমার সম্পূর্ণ

বশ হইয়া থাকিতে চাই,—ইহার কারণ এই যে আমি আমার ভার আর বহিতে পারি না। তাতে কেবলই যাতনা পাই, কেবলই ক্লেশ নিরাশা ও নিষ্ফলতা ভোগ করি, সুখ আরাম সদ্গতি পাই নাই। এই তো আমার ভিতরকার কথা। ইহা তো অতি নীচ ভাব, প্রভো! এ যে কামগন্ধপূরিত। ইহাতে তো ভক্তি লাভ কদাপি হয় না। এই সকাম ভজনা হইতে কবে এ অধমকে মুক্ত করিবে? ফলতঃ এই যে তোমার নাম করি, তাহাও তো নিজের স্বার্থের লোভে। নামের রস তো প্রভো! এখনও প্রাণে জাগিল না। প্রাতঃ সন্ধ্যা যখন তোমার স্মরণ করিতে চেষ্টা করি, তার মধ্যে চক্ষে জল তখনই আসে, যখন নিজের প্রিয়জনের ভিতর দিয়া আশৈশব তুমি কি দিয়েছ তাহা ধ্যান করি, তাতেই প্রাণে আনন্দ হয়। নইলে অন্য সময় পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ ভগিনী সখা সখী স্ত্রী পুত্র এদের চিন্তা যখন ছাড়িয়া কেবল নাম করি তখন তো কিছুই ভাব জাগে না। ঠাকুর, এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে কবে? কেন নামে রস পাই না? এক সময় তো এর চাইতে বেশী পাইতাম। কখনো মনে হয়, এ শুষ্ক জ্ঞানপ্রধান নামে আর বুঝি আমার রুচি হবে না। বরং যখন কৃষ্ণনাম মুখে আসে, আর অন্তরে সে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, সে কিশোররূপমাধুরী ভাসিয়া উঠিতে থাকে, তখন শরীর মন এক যেন অপূর্ব্ব রসের আভাস প্রাপ্ত হয়। এ কি, প্রভো! আমি তো কিছুই বুঝি না। এ কি ইন্দ্রিয়বিকার না অধ্যাত্মসম্পদ? ভোগী প্রকৃতি রসলিপ্সু প্রাণ, রূপের পিয়াসু চিরদিন,—তাই কি এই ধর্ম্মের ও সাধনের আবরণের ভিতরে ফুটীয়া উঠিতেছে? আমি কিছু বুঝি না। এই দেখি গুরো! যখন কৃষ্ণহে কৃষ্ণহে, কৃষ্ণহে, রক্ষ মাং কৃষ্ণহে, কৃষ্ণহে, কৃষ্ণহে ত্রাহিমাং বলি,—দু চার বার বলিতে বলিতে চক্ষুজ্জলে হৃদয় ভাসে, শরীর যেন পুলকে পুরিয়া উঠিতে চাহে। আবার যখন হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং—ইহা মুখে

উচ্চারণ করিতে থাকি, তখন আপনা হইতে ভিতরে তোমার দত্ত নাম আবৃত্তি হইতে থাকে। আবার এও বুঝি না, ঠাকুর,—যদি কৃষ্ণভজনাতেই আমায় টানিতে চাহ, তবে তোমার ভজনাই বা করি কেমন করিয়া? তোমার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি? এ কি আমার দৈনন্দিন গীতা ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠের ফল? তাও বুঝি না। এ পাঠে এত আরাম পাইতেছি যে ইহা বন্ধও তো করিতে পারি না। আমি, ঠাকুর কখনো জীবনে এমন সমস্যায় পড়ি নাই। এ সকল তোমারই লীলা। তবে আমায় আর দ্বিধার মধ্যে ফেলিয়া রাখিও না, এই প্রার্থনা করি। আমার চক্ষু খুলে দাও। তুমি ভিন্ন আমার চক্ষু খুলে এমন আর কাহাকে দেখি না। গুরো! অধমকে শিক্ষা দাও, তোমার চরণে এই ভিক্ষা মাগি।

হে গুরো! আজ তোমার চরণে বিশেষভাবে আমার এই জন্মভূমি মাতৃভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। আজ তোমার বিধানে আমি বন্দী, দেশের ভাইয়েরা যখন মাতৃবন্দনা করিতেছেন, মায়ের দুঃখ শোক মোচনের পন্থা বিচার করিতেছেন, আমি তখন এখানে আবদ্ধ। বড় সাধ ছিল যে তাদের সঙ্গে যাইয়া আবার এ সকল আলোচনা করিব। তুমি অন্য বিধান করিলে। তোমার ইচ্ছারই জয় খুব হইয়াছে—তাই হউক, তাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কখনো হবে না। তবে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ আজ তোমার চরণে দেশের কল্যাণ ভিক্ষা করিতেছে। প্রভো! কি পাপে বা কি কর্ম্মদোষে যে এমন জগৎকে এত হীন করিয়া রাখিয়াছ, তুমিই জান। দয়াল, আমাদের তাতে প্রাণে বাজে। এও তোমারই কৃপা। তুমি মুখ ফিরাইতেছ, তাই আমাদের প্রাণে এত যুগ যুগান্তর পরে, এই বেদনা অল্পে অল্পে জাগিতেছে। এ বেদনা তোমারই বেদনা, তোমারই অনুকম্পা, তোমারই কৃপা নির্দ্দেশ করিতেছে। আশা হয়, দয়াল, এ দুঃখের নিশ্চয়ই অবসান হইবে। এ দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচিবে।

সেই আশায় আজ তোমার চরণে প্রার্থনা করিতেছি, প্রভো, আমার মাতৃভূমির দুঃখ তুমি সত্বর দূর কর। আর, এ অধমের রাত্রিদিন তাঁরই সেবায় নিয়োজিত কর। এই তো তোমারই যজ্ঞ। এতদিন যা কিছু করিতে পারিয়াছি বা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাও তো তোমারই প্রেরণায়, তোমারই অযাচিত-দত্ত শক্তিগুণে, আমি যে অতি অধম, প্রভো! আমি তাহা জানি। অন্তর্যামী তুমি ত তাহা ভাল করিয়াই জান। আমি তো আজ সকালই তোমার হাতের পুতুল হইয়া, যে ভাবে নাচাইয়াছ, সেই ভাবে নাচিয়াছি। সকল মানুষই তো তাই, এ জগৎ সংসার তোমারই যে বিচিত্র রঙ্গালয়। এতকাল যা কিছু করিয়াছি, তাহা তুমিই করাইয়াছ। এখন যে আরো বাকি দিনও মায়ের সেবায়, জাতির কল্যাণসাধনে, দেশের দুঃখমোচনের চেষ্টায় অতিবাহিত হউক, এই ইচ্ছা করিতেছি। এ বাসনাও তো তুমিই জাগাইয়াছ। তোমার প্রেরণা, তবে প্রভো, তুমি পূর্ণ কর। তোমার চরণে এই প্রার্থনা। সাধুতার মন্ত্রে ভাল করিয়া দীক্ষিত কর। ঐ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, তাহা যে তোমারই বিলাস, তোমারই দয়া, ইহা বুঝাইয়া, প্রভো দেশের হিতে জীবন যাপন করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ অধমকে দাও। আমার গুণাগোষ্ঠী সকলে, এই ভাবে তোমার সেবা করুক। তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমারই জয়, গুরো! তোমারই জয়, তোমারই জয় হউক। তুমি ধন্য। তোমার নাম ধন্য! তোমার প্রেম ধন্য। তোমার অপার করুণা ধন্য।

হে দয়াল, তোমার কৃপায় আর একদিন কাটিয়া গেল। তার জন্য তোমার চরণে শত সহস্র প্রণাম করি। আমি ঠাকুর, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তুমি আমার জ্ঞানগৌরবকে সব ঘুলাইয়া দিতেছ কি? তাও তো বুঝি না। আমার মনে হয় যেন একটা নতুন সত্যের রাজ্যে যাইতেছি, কিন্তু সাহসে তাহাতে নির্ভর করিতে পারি না।

আমার অন্তরের অবস্থা তুমি তো সুস্পষ্টই বুঝিতেছ ; তাহা দেখিয়া তুমি আমায় চালাইয়া নেও, এই তোমার চরণে আমার প্রার্থনা ।

প্রভো ! আজ আবার তোমার চরণে আমার এই পতিত মাতৃভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহার দুঃখ যাতনা তুমি দূর কর। যে অলৌকিক অধ্যাত্ম সম্পদ তুমি ইহাকে দিয়াছিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে দয়াল, জগতে কি তাহা পাবে না ? ইহার ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষা কর। ইহার সন্তানগণের জীবনে শক্তি, প্রাণে সাহস, হৃদয়ে ভক্তি দাও, যেন ইহারা প্রাণপণে মাতৃসেবায় সমুদায় উৎসর্গ করিয়া তোমার লীলা প্রচার করিতে পারে। প্রভো ! কৃপা কর, কৃপা কর।

আর এ অধমকে এখন কোন্ তালে নাচাইতে চাও, বল দেখি। যদি তোমার ইচ্ছায় এ বন্ধন জীবন মুক্ত হয়, তবে কোন্ কাজে লাগাইবে ? আমি তো কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। আমি বুঝিতে ও জানিতেও চাহি না। কেবল তোমাতে আমার মতি থাকুক এই করিও ঠাকুর। আমাকে আর ভুলাইও না। আমার আমিত্ব, অভিমান, অহঙ্কার, বিষয় পিপাসা, এ সকল নষ্ট কর। করিয়া, লীলাময়, তুমি জীবনের সকল সম্বন্ধের মধ্যে সুপ্রকাশিত হও। তোমার সেবাতে এইরূপে নিযুক্ত কর। আর আমি যেন সত্যভাবে, আপনার সর্ব্ব-প্রকারের স্বামিত্ব, কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সতত এই বলিতে পারি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি॥

এই আশীর্ব্বাদ এ অধমকে কর। তোমার চরণে এই প্রার্থনা। জয় গুরো! তোমারই জয়, তোমারই জয়, তোমারই জয়। তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য। তোমার চরণে শত সহস্র প্রণাম।

হে প্রভো! তুমি তো অন্তর্যামী, অন্তরের কথা, ভিতরকার অবস্থা, সকলই তো জানিতেছ। আমি নিজে আমাকে তো ভাল করিয়া কিছুই বুঝি না। আমি কেবলই সন্দেহে পড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি। পড়াশোনা করি, তাতেও যেন, ঠাকুর, এই বিক্ষেপকেই বাড়াইয়া দেয়। এই কি বস্তু, এই কি বস্তু, এই বুঝি সত্য, এই বুঝি তত্ত্ব, কেবল এমনি করিতেছি এমন অন্ধকারে জীবনে আর কখনো আপনাকে অনুভব করি নাই। দয়াল, এ অন্ধকার দূর করিয়া, সত্যে স্থিরমতি জন্মাইয়া দিবে কি? না এইই জীবের উদ্ধারের ও কল্যাণের পথ? আমি বিষয় ছাড়িয়া কিছুতেই তো তত্ত্ববস্তুকে ধরিতে পারিতেছি না। আমার এ কি হইল? নাম যখন করি, অনবরত জপিতেছি, কিন্তু বস্তুজ্ঞান হয় না, ভাবেরও সঞ্চার হয় না। যখন নামের সঙ্গে তোমাকে, গুরো! ধ্যান করিতে যাই, তাও অনেক সময় বড় হাল্‌কা হইয়া পড়ে, ভাবোদয় হয় না। যখন তোমার রূপ ধ্যান করি, তখন মন নরম হয়, কিন্তু প্রেমভক্তি জাগে না। যখন তুমি মাঝে মাঝে যে স্নেহ দেখাইয়াছ, তাহা স্মৃতিতে আনি, তখন চোখ জলে ভরিয়া উঠে। আবার যখন ঐ চরণে নিজের সুখদুঃখ সমর্পণ করি, আপনার হালে পানি পায় না দেখিয়া যখন অসহায় হইয়া, আপনার যোগক্ষেম বহনের জন্য তোমার চরণাশ্রয় লই, তখন মন কতকটা শান্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাব খোলে, যখন নিজের জীবনের গত সুখ স্নেহ মমতা প্রেমের সম্বন্ধ সকল স্মরণ করি। ঠাকুর, মানুষের মুখ, মানুষের রূপ, মানুষের ভালবাসা, মানুষের দয়া, মানুষের কাজ এ সকল ভাবিলেই আমার ভাব জাগে। মা, বাবা, শৈশবের ধাত্রী, পরিচারক,

শৈশবের সহচর, বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সখাসখী, সমবয়স্ক ও গুরুজন, এ সকলের স্মৃতিতে চোখ জলে, প্রবল ভাবে পূরিয়া উঠে। এ সকলকে ছাড়িয়া আমিতো, দয়াল, ভাবের অবলম্বন আর কিছু পাই না। এ সকল কি? এরা কারা? এদের অনেকেই তো এ লোক হইতে সরিয়া গিয়াছেন,—কোথায় আছেন জানি না। যাঁরা এ জগতে এখনো আছেন, তাঁদেরও তো সান্নিধ্য সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না এই নির্ব্বাসনে। অথচ এদের কথাতেই, এদের চিন্তাতেই, এদের ধ্যানেই আমার উপাসনা ও ভজন সবল ও সজীব হয়, এ কি আমার বিষয়-লিপ্সার বিকার, দয়াল? এ কি আমার ঘোরতর সাংসারিকতার পরিচয়? এ কি, অন্তর্যামী, কেবল কামের লীলা? আমি এর কিছু বুঝি না। নিরাকারে ভাবনা হয় না, তাতো দেখিলাম। অন্য বস্তুই বা কি? এ সকলে ভগবৎপ্রকাশ হয়, সত্য; কিন্তু স্বরূপ আর প্রকাশ তো এক নহে। এই সকলের ভিতর দিয়াই কি স্বরূপে যাইতে হয়? আর একান্ত বিষয়াশক্তি হইতেই যে এ ভাব জন্মে, তাও বলি কেমন করিয়া? কারণ এ সকল অনিত্য, এ তো আমি জানি। এ গুলিকে যখন ধ্যান করি, তখনো এদের অনিত্যতা যে ভুলিয়া যাই তাহা নহে। তবে আস্বাদন করি কি? না যে সম্বন্ধ এ সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধের মাধুর্য্য ও মহিমা। এ সকল রস আস্বাদনের আর অন্য উপায় কি, জানি না। গুরো! আমার এ সন্দেহ দয়া করিয়া দূর কর। আমার সত্য অবস্থা বুঝাইয়া দাও। অথবা, তাই বা চাহি কেন, আজন্মই তো তুমি চালাইয়াছ,—এখনো চালাইতেছ। যে ভাবে হউক, সেই ভাবেই চালাও। তোমার চরণে আমাকে কেবল আশ্রিত রাখ।

তোমার চরণে, দয়াল, আমার মাতৃভূমির কল্যাণ ভিক্ষা করিতেছি। পুরোহিতদিগকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, তাদের স্বদেশপ্রেম নির্ম্মল কর।

আর প্রভো। এই প্রেমকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত কর। এই প্রার্থনা করি। জয় গুরো! তোমারই জয়, তোমারই জয়, তোমারই জয়। তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য!

হে গুরো, তোমার চরণে শত সহস্র প্রণাম করি। প্রভো! দিনের পর দিন তোমার প্রসাদে একরূপ ভালই কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু মন কেন, ঠাকুর, কিছুতেই অন্তর্মুখীন হইতে চাহে না? তোমার নাম করি, লাগে ভাল, আবার কখনো কখনো নাম তোমার করে রসনা, কিন্তু মন ধ্যান করে নানা বিষয়। এতে কি নামাপরাধ হয় প্রভো! আমি জানি না, যদি অপরাধ হয়, তাহা নিবারণেরও উপায় আমার কাছে নাই। তোমার চরণগুণে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবেই সম্ভব। গুরো! তোমার একটা কথার উপরে প্রথমাবধিই একান্ত আস্থা রাখিয়া আসিয়াছি, সে কথা এই যে সময় যখন হয়, তখন আপনা হইতে সকল দিক্ খুলিয়া যায়—ভয় নাই, ভাবনার কারণ নাই। এ কথা গুলো যুগাধিক কাল পরেও আমার কাণে বাজিতেছে। সময় কবে হবে, প্রভো! তারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমার সাধনভজনের শক্তি নাই।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া—

আমি যে এ আদেশ পালনে অসমর্থ। আমি সত্যই বুঝিয়া উঠি না, আমার স্বভাব কিরূপ? আমার প্রকৃতি কি তামসিক, না রাজসিক? তামসিক নহে বলিতে সাহস পাই না, অথচ প্রমাদালস্যনিদ্রাদি তমো-লক্ষণও তো তেমন আপনার মধ্যে ধরিতে পারি না। রাজসিক? তাও তো খুব পরিষ্কার রূপে বুঝি না—কর্ম্মসু অশমঃস্পৃহাদম্ভাহঙ্কারসমন্বিতাঃ—এও তো ঠিক নহে। কর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে—কিন্তু নিবৃত্তিও আছে। প্রবৃত্তি রজোসম্ভূত, নিবৃত্তি তমোভূত, তাই কি প্রভো! সাত্ত্বিকতাও যে একেবারে নাই, তাও ঠিক বুঝি না। আমার নিজেকে একটু পরিষ্কার

করিয়া বুঝাইয়া দাও, দেব! নতুবা আমার স্বধর্ম্ম কি, তাহাও তো বুঝিতে পারি না। এই যে আমি বিষয়ের মধ্যে সতত অধ্যাত্মসম্ভোগ অন্বেষণ করি, ইহা কি তমঃ? এই যে ভগবচ্চিন্তা করিতে সেবাই আমার আজীবনের যত স্নেহ প্রেম সেবা দয়া দাক্ষিণ্যাদি সম্ভোগ ও অভিজ্ঞতা, ও যে সকল আধারে এ সকল ভোগ করিয়াছি, তৎসমুদায় আমার প্রাণে জাগিয়া উঠে ও আমার ভাবকে ফুটাইয়া তোলে, শরীর মনকে পুলকিত করে,—ইহার অর্থ কি? এ কি অসারে সারভাবনা, অসত্যে সত্যবুদ্ধি, এ কি তমঃস্বভাব ধর্ম্মাধর্ম্মের অর্থবিপর্য্যয়বোধ, না, লীলার আস্বাদন, আমি ঠিক করিতে পারি না। এই সকল অবলম্বন, এ সকল রূপ গুণ যদি ছাড়িয়া, এ সকল চিন্তা হইতে ভগবচ্চিন্তা যদি একান্ত বিচ্ছিন্ন করি, তাহা শূন্যগর্ভা, বাক্যময়ী, কল্পনাময়ী, একান্ত নির্গুণ হইয়া পড়ে। আর ভগবান্‌কে ধরিতে পারি না। আমি রূপের ভিখারী, আমি স্নেহ-মমতার কাঙাল। আমি যে আধারে এ সকল পাইয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া কোন তৃপ্তি কোন আরাম চিতে পাই না। পিতার চরণধ্যানে চক্ষে জল আসে, ভক্তি জাগে—পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি বলিয়া শূন্যপানে যত কেন তাকাই না, তাতে চিত্তে ভাব জাগে না। মায়ের চরণধ্যানে—সেই ষোড়শী যুবতী যাঁর কোলে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই, যিনি অপূর্ব্ব, অনাবিল স্নেহদানে প্রাণের মত সযতনে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, যাঁর জীবনফুলের প্রথম ফল আমি,—আর যাঁর নশ্বর দেহ এই অধমের বুকেই শেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে—সজ্ঞান শেষ দৃষ্টি যাঁর এই অধমের মুখেই নিবদ্ধ হয়—তাঁর চরণ, তাঁর রূপ, তাঁর গুণ ধ্যান না করিয়া মা, মা, বলিয়া শত চীৎকার করিয়াও তো আমার মাতৃপূজা হয় না, ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। এইরূপ বন্ধু-বান্ধব, ভাই ভগিনী দাসদাসী, পত্নী, কন্যা, পুত্র, আচার্য্য, শিক্ষক, গুরু,—এদের দেহ, এদের রূপ, এদের গুণ, এদের সঙ্গে আমার

দেহের, আমার মনের, আমার হৃদয়ের, আমার প্রাণের, আমার আত্মা যাকে বলি, তার যে সম্বন্ধ, এ সকল ছাড়া আমার তো ভজনা হয় না। অথচ এইই ঠিক ভজনা কি না, তাও বুঝি না। হে দয়াল, এ সমস্যা ভাঙ্গিয়া দাও। তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা।

হে প্রভো! হে গুরো! হে জীবনাধিপ, তোমার নিয়তিতে এই বন্ধনের আর এক মাস কাটিয়া গেল। এই মাস কাল মধ্যে তোমার অশেষ করুণা উপভোগ করিয়াছি। স্বাস্থ্য দিয়াছ, তাই সুস্থ ছিলাম। স্থৈর্য্য ও ধীরতা প্রতিদিন দিয়াছ, তাই অস্থির ও অধীর হই নাই। তোমার নাম করাইয়াছ, তাই নাম করিয়া কত শক্তি কত আরাম লাভ করিয়াছি। প্রাণে নানা ভাব, নানা চিন্তা, নানা তত্ত্বাভ্যাস প্রকাশ করিয়া মনকে নূতন নূতন সত্যের আস্বাদন দিয়াছ, তাই সে সকল আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কত আশা, কত উৎসাহ জাগাইয়াছ, কত সংকল্প ফুটাইয়াছ,—এ সকলের জন্য আজ প্রণত হইয়া তোমাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। প্রতিদিন স্বল্প বিস্তর পরিমাণে, শাস্ত্রাদি পড়াইয়াছ, আর প্রভো! জ্ঞানপিপাসা, প্রেম লালসা, তোমার আনন্দ সম্ভোগের লিপ্সা, কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া, ও নিত্য নূতন ভাবে চিত্তকে মুগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়া এই দৈহিক বার্দ্ধক্যের আক্রমণেও যে অন্তরের যৌবন একরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ, তার জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দেই। শেষ দিন পর্য্যন্ত ঠাকুর, এটি দয়া করিয়া আমার দিও। নিত্য নূতন জ্ঞান, নিত্য নূতন ভাব নিত্য নূতন রস, নিত্য নিত্য নূতন কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া, অধমকে প্রকৃত পক্ষে বাঁচাইয়া রাখিও, এই চাহি। গাছে যদি ফুল না ফোটে, বসন্তসমীর চুম্বনে যদি বিকচ পল্লব পুলকিত না হইয়া উঠে, নূতন ফল যদি না জন্মে, তবে তার জীবন মরণ সমান হইয়া যায়। মনুষ্যেরও তাহাই। মানবজন্মের মহত্ত্ব ও বিশেষত্বই তার এই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম;—

এ যদি ফুরায়, জ্ঞান-প্রেম কর্ম্মের স্রোত যদি একান্ত শুকাইয়া যায়, তবে সে যে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। জীবন্মুক্তি পাবার অধিকার নাই,—ঠাকুর, এ অধম সে আব্দার এখনি তোমার চরণে করে না। কিন্তু দয়াল, দোহাই তোমার প্রেমের, দোহাই তোমার নামের, দোহাই তোমার অযাচিত পতিতপাবনী করুণার,—যখন চরণে অধমকে অঙ্গীকার করিয়াছ,—জীবন্মৃত করিয়া রাখিও না। জ্ঞানপিপাসা, প্রেমলালসা তোমার, সাত্ত্বিক আনন্দ ও তোমার এই যে অনন্ত নিখিলরসামৃতময়ী মানুষী লীলা,—তাহা সম্ভোগের ইচ্ছা ও শক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বে, দয়াল, এই বাসা ভাঙ্গিয়া দিও। "বাসাংসি জীর্ণানি তথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নবোপরাণি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণম্যনানি সংযাতি নবানি দেহী" —তখন, প্রভো! এই বিকল সংস্থান ও বিবশ ইন্দ্রিয়কুলকে পরিত্যাগ করিয়া তব শ্রীচরণপ্রসাদাৎ বিশুদ্ধতর, সাধনের অধিকতর অনুকূল, অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়াদি লইয়া, আবার জন্মিয়া, শুদ্ধভাবে, তোমার এই অপূর্ব্ব লীলামাধুরী সম্ভোগ করিব। দয়াল, তাই চাই। আমি তোমার চরণে মুক্তি চাহি না। চাহি ঠাকুর ভক্তি। চাই তোমাকে সর্ব্বদা সম্ভোগ করিতে। চাহি তোমার নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির নিরন্তর অর্চ্চনা করিতে। চাই, হে মোহন, আমার শুদ্ধইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশরূপে নিয়ত তোমার ভজনা করিতে। এই লোভ বহুদিনই অন্তরে, অন্তঃশীলার মত, ধীরে ধীরে নড়িতে চরিতেছিল। তাই বন্ধনে আনিয়া, এই এক মাসের মধ্যে বিশেষতঃ ইহাকে তুমি একটু আধটু ফুটাইয়া তুলিয়াছ। অপূর্ব্ব তোমার কৌশল, অদ্ভুত তোমার চেষ্টা। তুমি কি দিয়া যে কি কর, তাহা তুমিই জান। আমরা তার কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। এই যে এখানে আসিয়া, এ অধমের কি না কল্যাণ করিতেছ। যে সকল ইন্দ্রিয়, রিপুর মত তাড়না করিয়া বেড়াইত, তাদের তুমি অদ্ভুত কৌশলে, ক্রমে শান্ত ও সৌখ্যপূর্ণ করিয়া যেন তুলিতেছ। প্রভো! কখনো ভাবি নাই,

এ জন্মে সাত্ত্বিকভাবে রূপ চিন্তা করিতে পারিব,—তারও আভাস তুমি দিতেছ। মা যেমন সন্তানের স্বাস্থ্যের বা পুষ্টির কথা মুখে আনিতে সাহস পায় না,—আমিও ঠাকুর, এ সকল তোমার অদ্ভুত করুণার কথা মুখে আনিতে ভয় পাই, কি জানি তাহাতে অভিমান প্রকাশ পায় ও তোমার করুণা ক্ষুণ্ণ হইয়া আমার কর্ম্ম-বৈগুণ্যে বিমুখী হইয়া যায়। অন্তর্যামি, তুমি সকলই দেখিতেছ। তোমাকে আমি আর কি বলিব? দয়া কর, দেব, দয়া কর। রক্ষা কর, প্রভো, রক্ষা কর। এ ভাব, এ অবস্থা স্থায়ী কর। এই ভাব বাড়িয়ে দাও। নির্ব্বিকার কর, দয়াল, নির্ব্বিকার কর। নতুবা এ অধমের আর গতি নাই। আমাকে এম্‌নি করিয়াই গড়িয়াছ যে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়াই আমার গতি, ইহাই তোমার বিধানে, আমার কর্ম্মফলে আমার অনন্যা নিয়তি। তবে প্রভো! এই প্রবৃত্তিকুলকে নির্ম্মল, সাত্ত্বিক, অকামী, তোমার চরণাভিমুখীন যদি না কর, তবে আর আমার গতি কোথায়? দয়াল, রক্ষা কর। পতিতং মাং সমুদ্ধর। পতিতং মাং সমুদ্ধর। পতিতং মাং সমুদ্ধর।

হে গুরো! আবার এই নূতন প্রভাতে তোমার চরণে অন্তরের একান্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা লইয়া উপস্থিত হইলাম। হে গুরো! এই বন্ধনের মধ্যে প্রতিদিন এ অধমকে কত প্রকারে যে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, শরীর মন প্রাণকে যে কত যত্নে, মায়ের মত বুকে করিয়া যেন রাখিতেছ,—এ ঋণ জন্মজন্মান্তরে কখনো শোধ দিতে পারিব না। কৃপা কর ঠাকুর, যেন তোমার চরণে নিয়ত মগ্ন হইয়া থাকি। তুমি এ সংসারে তো কতই না যশ মান, আনন্দ তৃপ্তি, স্নেহ মমতা দিলে, আর প্রতিদিন কত দিতেছ—এ সকল আমার স্বপ্নের মত বোধ হয়। পণ্ডিত নহি, কিন্তু তুমি রসনায় ও লেখনীতে অধিষ্ঠ হইয়া, তার মধ্য দিয়া কত জ্ঞান, কত ভাব, কত বল, কত উদ্দীপনা ও কত সাধু প্রেরণা প্রকাশ করিতেছ। ভক্ত নহি, অথচ, তোমার আবেশে কত ভক্তি-তত্ত্ব জানিতেছি

ও মাঝে মাঝে জানাইতেছি। নিরাকারের নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে পথহারা হইয়া বেড়াইতেছিলাম,—আনন্দ, লীলা—এ সকল মানসী, কল্পিতা, মূর্ত্তি রচনা করিয়া বুঝিতে ও ধরিতে চেষ্টা করিতেছিলাম,—কখনো প্রকৃতির শোভাতে, কখনো মানবের চরিত্রে, কখনো সভ্যতা ও সাধনার বিকাশে, কখনো পরিবার ও সমাজের বিবিধ সম্বন্ধের ভিতরে,—তোমাকে ও তোমার প্রেম, তোমার আনন্দ, তোমার করুণা, তোমার লীলা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু সকলই আবছায়ার মত দেখিতেছিলাম, সকলই নিতান্ত মানস-তন্ত্র, কল্পনাতন্ত্র,—অধ্যাসিত ও আরোপিত বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহাতে সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কখনো পারি নাই। সর্ব্বদাই ততঃ কিং—তার পর কি, এই প্রশ্ন ভিতরে ভিতরে, নিগূঢ়ভাবে, অলক্ষিতে প্রাণে জাগিয়া, আমার ধর্ম্মকর্ম্ম, আমার সাধন সম্ভোগ—সকলকে যেন ফাঁকা, ভিত্তিহীন করিয়া তুলিত। সন্তানকে বুকে ধরিয়া, চোখ বুজিয়া, তার স্পর্শে তোমার স্পর্শ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতাম,—কিন্তু এই নশ্বর সন্তান-দেহ ক'দিন,—তারপর কোথায় বাৎসল্য—এই প্রশ্নের উত্তর পাইতাম না। একটা generalisation করিয়া, সেই generalisation বস্তু ভাবিয়া, মনকে আশ্বস্ত করিতাম। কিন্তু generalisation, হে দেব, কখনো তো বস্তু হয় না। সৌন্দর্য্যের generalisation তুমি, বাৎসল্যের generalisation তুমি, মাধুর্য্যের generalisation তুমি—ইহাতে তো মন তৃপ্ত হয় না। সে তৃপ্তি কোথায়? এই যে রূপ-পিপাসা,—ইহা কি রাবণের চিতার মত চিরকাল কেবল জ্বলিবে ও জ্বালাইবে, তার নিবৃত্তি, তৃপ্তি কি কখনো কোথাও হবে না? যদি না হয়, তবে এ যে মায়া-মরীচিকা—আর তবে তোমাকেই বা সুন্দর, বলি কেমনে? আর এ রূপ তো মানুষ ছাড়া আর কোথাও নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আরোপিত; মানুষ আপনার অন্তরের রস প্রকৃতির অঙ্গে ঢালিয়া প্রকৃতিকে সুন্দর

করে। তার অন্তরের যে সৌন্দর্য্য ও সম্ভোগ তারই পুটে এই প্রকৃতির শোভা ও মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। নায়ক নায়িকার অন্তরস্থ প্রেম ও রস এ সকল অবলম্বনে বাহিরে ফুটে। নায়ক নায়িকা যদি না থাকে, প্রকৃতির সত্তা থাকে, সৌন্দর্য্য থাকে না। মানুষে যেমন সৌন্দর্য্য, বাৎসল্য মধুরাদি আস্বাদন করি, সেইরূপ রূপও এই আধারেই পাই। মানুষ ছাড়া আর কোথাও তো প্রাণের তৃপ্তি ও আরাম, আত্মার আশ্রয় ও অবলম্বন দেখি না। অথচ এই মানুষও মর্ত্ত্য মৃত্যুর অধীন, আজ আছে কাল নাই। ঠাকুর! তবে এ সকলই কি কেবল মোহের ছলনা? এ কেবল মায়ার খেলা? কেবল কি দুঃখ-হেতু; জ্বালার নিদান? তাহা হইলে এই জগৎলীলার সত্য ও সার্থকতা যে কিছুই থাকে না। এই সকল ক্রমে অন্তরে প্রকাশিত করিয়া, এই সকল প্রশ্ন তুলিয়া, হে দয়াল, তুমি এমন এক পথে এ মনকে চালাইয়া নিতেছ, যে পথে চালিত হবে কখনো কল্পনাতে মনে করি নাই। চল গুরো! নিয়ে চল,—তোমার হাতখানি যদি দেখাও, তবে আমি অভয়ে যে কোন অজ্ঞাত পথে হউক না কেন, চলিতে পারিব। হাতে ধরিয়া লইয়া চল। আর অস্থিরতায়, আর সংশয়ে রাখিও না! শ্রদ্ধা দাও, প্রত্যক্ষ জ্ঞান দাও, প্রভো! তত্ত্ব-বস্তু প্রকাশিত কর। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।'

হে গুরো! ক্রমে ক্রমে তুমি কৃপা করিয়া এই বন্ধনের শেষদিনে আনিয়া উপস্থিত করিলে। বাকি যে কয় ঘণ্টা আছে, তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তেমনি করিবে। কত ভয়, কত ভাবনা, কত অশান্তি আবার কত নির্ভয়, কত শান্তি, কত আরাম, কত নূতন নূতন ভাব ও প্রেরণাও, যে এই ছয়মাসকাল পাইয়াছি, তাহা তুমি সকলই জান। কিন্তু এ সকলের মধ্যে তোমার আশ্রয় ও তোমার করুণা, অটল ভাবে আমার সঙ্গে থাকিয়া, আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমি যে কত

অক্ষম, কত দুর্ব্বল, কত হীন, কত অবিশ্বাসী, এই ক'মাসের মধ্যে, মাঝে মাঝে দুঃখ ক্লেশ, অশান্তি ও ভয় ভাবনায় ফেলিয়া তাহা তুমি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়াছ। ঠাকুর! এ শিক্ষা যেন আর কখনো জীবনে ভুলি না। আর যেন কখনো, দেব! অলক্ষিতেও আপনার 'পর ভর করিয়া চলিতে চাহি না। আর যেন, দয়াল! কোন প্রকারে এই আমার অধম আমিত্ব ও স্বামিত্বকে কোনো ব্যাপারে, কোনো ক্ষেত্রে, জীবনের কোনো সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই না। মাথা তুলিয়া, আপনার গরবে পূর্ণ হইয়া প্রায় সারা জীবনইতো কাটাইলাম, বাকি যে কটা দিন, তুমি দয়া করিয়া এ সংসারে রাখিবে, সে কটা দিন যেন, প্রভো! লোকের পায়ের কাদা হইয়া কাটাতে পারি। সকল সম্বন্ধের মধ্যে, হে দয়াল! যেন আপনাকে পরের অধীন করিয়া রাখিতে পারি। আমি দাস, সকলে আমার প্রভো; আমি সেবক, সকলে আমার সেব্য; সকলের মধ্যে তুমি আছ, আর সকলের ভিতর হইতে তুমি আমার সপ্রেম সেবা চাহিতেছে,—অনাবিল সেবা চাহিতেছে,—এই জ্ঞান সতত চিত্তে উজ্জ্বল রাখিও। দূর হইতে ভাবিতেছি, এবার যদি তুমি সুযোগ দাও, তবে, ঠাকুর, ভগবদ্ভাবে স্ত্রী পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ ও স্বদেশ, —সকলের সেবা করিব। আর কারো উপরে জোর করিয়া, নিজের ইচ্ছা চালাইতে চাহিব না। তুমিই যে সর্ব্বনিয়ন্তা,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়েন মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতীম্॥

—এই মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। তুমিই তো, সকলকে, স্ত্রীকে, কন্যাকে, পুত্রকে, ভ্রাতা, সখা, আত্মীয় স্বজন-সকলকে, আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী পরিচালিত করিতেছ; আমি মোহবশতঃ আপনাকে

কর্ত্তা ভাবিয়া, এতকাল ইহাদিগকে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ঠাকুর ইহাতে তোমার মর্য্যাদাহানি হয়, এ কথা বুঝি নাই। এখন হইতে প্রভো! এই অপরাধে আর যেন অপরাধী না হই। আমার নিজের প্রতি যখন চাহি, তখনই তো দেখি, ঠাকুর, কোনো লোকের পীড়নে শাসনে, উপদেশে, সাক্ষাৎভাবে, আমাকে এখানে আনে নাই। আমি প্রবৃত্তির বশেই আজন্ম চলিয়াছি, যখন যাহা খেয়াল, তাই করিয়াছি। সদসদ্ বিচার কখনো করি নাই। প্রেমের পথেই বিচরণ করিয়াছি, আর হে পরম দয়াল! ঐ পথের ভিতর দিয়াই তুমি আমাকে প্রেমের দ্বারে আনিয়াছ। আমায় যখন এই কৃপা করিয়াছ, তখন আর অপরের জন্য আমার ভাবনা হবে কেন? যারা সাধন ভজন করিয়া ধর্ম্ম পায়, সাধনবলে তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তারা অপরকে শাসন করিতেও বা পারে। কারণ তাদের জীবনে অন্য অভিজ্ঞতা নাই। তারা সংযমের ভিতর দিয়া, নিবৃত্তির পথে, প্রেমের সন্ধান পেয়েছে। অন্য পথ তারা জানে না। আমার তো সে অভিজ্ঞতা নাই। আমি তো প্রবৃত্তিরই দাস, ভোগলিপ্সু। আজন্ম কামোপভোগপরায়ণ হইয়া কাটাইলাম। এমন যে আমি, আমাকেও যখন, তুমি, তোমার চরণাশ্রয় দিয়াছ, তখন তর্কনিষ্ঠ, অশ্রদ্ধাবান, অবিশ্বাস প্রবল যে এই মন ও বুদ্ধি, তাহাতেও যখন, অপূর্ব্ব কৌশলে, অলক্ষিতে, কি ইন্দ্রজাল প্রভাবে জানি না,—তাহাতে যখন তিলে তিলে পরমতত্ব গুরুতত্ব ও ভগবতত্ব প্রকাশ করিয়া, অপূর্ব্ব সম্পদের আভাস দিয়াছ,—তখন ভবে আর ভাবনা কার থাকিতে পারে? হয় নিবৃত্তির পথে, না হয় প্রবৃত্তির পথে,—যে পথে হউক, তুমি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সকলকেই পরমপথে আনিয়া তুলিবে, তবে আমি ইহাদেরে শাসন করিতে যাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিব কেন? শাসন নহে, প্রভো! আর শাসন নহে, নিত্য সেবা, নিঃস্বার্থ সেবা, অনাবিল সেবা, ভক্তিমাখা সেবা, এই আমার বিধান, এই আমার

কর্ম্ম, এই আমার সাধন ভজন হউক। ইহাদের মধ্যে সতত কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি কর। কৃষ্ণভাবে তাদের সেবা ও ভজনা করিতে শেখাও। ঠাকুর, পরিবার মধ্যে, আবার সংসারে ফিরিবার মুখে তোমার চরণে এই ঐকান্তিক প্রার্থনা করি।

আর ঠাকুর! এই বন্ধনের মধ্যে তুমি দয়া করিয়া যে দুইটী তত্ত্বাভাস প্রকাশ করিয়াছ, তাহা সমুজ্জ্বল কর। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বই যে বিশ্বের পরমতত্ত্ব ইহার আভাস পাই নাই। এই তত্ত্বে অচল, অটল, প্রতিষ্ঠা দাও। ঠাকুর, অল্পবয়সে, যৌবনমদে, আপনার খদ্যোতদ্যুতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া এই পরমতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া পিতা, মাতা, পিতৃলোক সকল হইতে, একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ এই তথ্য পাইয়া, এই কৃষ্ণনাম করিয়া এই রাধাগোবিন্দ নাম কণ্ঠে লইয়া, ঠাকুর! তোমার অযাচিত করুণাগুণে, পিতা, মাতা, পিতৃকুল, মাতৃকুল, কুলেপুরোহিত, কুলগুরু, সকলের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনে সুখ ও সৌভাগ্য অনুভব করিতেছি। ব্রহ্মনামে পিতামাতার প্রাণে সে আনন্দ সঞ্চারিত হইত বলিয়া মনে হয় না, বিশেষ আমার মত সাধন-ভজনহীন লোকের মুখে ঐ সংযমী সন্ন্যাসীদের সেব্য ব্রহ্মনামে, তাঁদের প্রাণে যে আরাম হইত, তাঁহাদের ইষ্টনাম, প্রিয়নাম, সাধিত নাম, এই কৃষ্ণনাম এ অধমের মুখেও শুনিয়া তাঁদের শতগুণ, ও সহস্রগুণ বেশী আনন্দ ও প্রীতি হইতেছে। এতদিন আমি তাঁদের মণ্ডলীর, আপনার পিতৃগোষ্ঠীর বাহিরে ছিলাম, এই মধুরনাম গুণে, তোমার অপার করুণাবলে, মনে হয় যেন, অতি হীন হইয়াও আমার সেই গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াছি। এই চিন্তায় প্রাণে অনুপম আনন্দ হয়। ঠাকুর! এ তোমারই করুণার ফল। তবে বড় সাধ প্রভো! আমার গণ-গোষ্ঠী সকলে, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা, জামাতা ও জামাতৃ-পরিবারবর্গ, আমার বন্ধুবান্ধব, যাদের ভালবাসি, যারা এই হীনজনকে ভালবাসা দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন,—তারা সকলে এই নাম আস্বাদন

করে। সকলে এই পরমতত্ত্ব লাভ করে। সকলে তোমার গণ হইয়া তোমার চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। আদরে চরণে টানিয়া লহ, দয়াল, তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা।

ঠাকুর! তুমি এ হীনজনকে যেভাবে লোকচক্ষে বাড়াইয়া তুলিলে, তাতে আমার আনন্দ হয় না, এমন নহে। কিন্তু অন্তর্যামিন, তুমি জানো, এ আনন্দ ভয়বিষাদ মিশ্রিত। ইহা যেন প্রভো! আমার পতনের কারণ না হয়। শেষ রক্ষা করো গুরো! শেষ রক্ষা করো। এতকাল, যখন লোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিত, তখন অভিমানে আঘাত পড়িত বলিয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনার উদয় হইলেও, তাহা স্বাভাবিক ছিল। তখন ভাবিতাম, এরা কেন আমায় খোঁচাইয়া, আমার ঘুমন্ত অভিমানকে জাগাইয়া তোলে। ঠাকুর! যা শুনিতেছি ও বুঝিতেছি, তুমি এখন বুঝি এ উত্তেজনা হইতে মুক্তি করিবে। অনেকেই এখন, আমি অকৃতি হইলেও, আমাকে বড় করিয়া তুলিতেছেন। এখন যদি এ মাথা একবারে নিচু না হইয়া যায়; এখনো যদি মাটিতে মিশাইয়া না যাইতে পারি, এখনো যদি, সত্য সত্য বিনয় লাভ না করি, তবে আর কখন করিব? দয়াল, এটী করো, আমাকে মাটীতে মিশিয়ে দাও। দম্ভ অহঙ্কার সব নষ্ট কর। দর্প কি আর আছে, ঠাকুর? অহঙ্কার কি রেখেছ! মাথার এক এক গাছা চুল পর্য্যন্ত এই ছয়মাসে তোমার অদ্ভুত কৃপা-লীলাতে যে বিকাইয়া গিয়াছে। দর্পের যে আর কিছুই রাখনি। আমাকে সম্পূর্ণ অসহায়, নিঃসম্বল, শক্তিশূন্য করে, তোমার সাহায্য, তোমার চরণ সম্বল, ও তোমার করুণাশক্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছ। দয়াল আবার বলি, মুহূর্ত্তের জন্যও এ চিত্তে আমার আমিত্ব ও অভিমান স্থান না পায়। সকলের পায়ের কাদা কর।

ঠাকুর! তোমার নামে এই ক'মাস যে অভ্যাস জন্মাইয়াছ, তাহাও রক্ষা করিও। তিনসহস্র নাম, দৈনিক, অন্ততঃ যাতে করিতে পারি,

সে আশীর্ব্বাদ, সে শক্তি ও সে সুযোগ যেন সর্ব্বদা পাই। ভক্তিভরে,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানীনাং মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ" এই নিয়ম ধারণ করিয়া, দয়াল, যাতে তবদত্ত মহানাম সতত কীর্ত্তন করিতে পারি, দিনের দিন যাতে নামের শক্তি ও তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, এই আশীর্ব্বাদ কর। আর যেন নাম ভুলি না। ভুলাতে অনেক আছে, কিন্তু তুমি কাণ্ডারী হয়ে থে'ক, তাহা হইলে আর ভুলিবার ভয় থাকিবে না।

ঠাকুর! এই ক'মাস, তোমার প্রসাদে, নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায়ও বেশ চলিয়াছে। এই স্বাধ্যায় যেন ভঙ্গ না হয়। ঠাকুর, এটীও দেখ। এসকলে আমায় এই বন্ধনে জড়াইয়া রাখিয়াছে, এ সকল দিয়া আমার এ বন্ধনকে তুমি অশেষ মঙ্গলের হেতু করিয়াছ; এসকল যাতে আর অবহেলা না করি, এখন সে টুকু করিও। দয়াল, তোমার চরণে এই প্রার্থনা করি।

আর, ঠাকুর,—আর একটা ভয় প্রাণে জাগিতেছে। যে তত্ত্বজ্ঞান তুমি দেখাইয়াছ, তাহা গোপন রাখিব, না প্রকাশ করিব। ঠাকুর! আমি কিছুই বুঝিতেছি না। একি প্রচার করিব, না নিজে নিজে, গোপনে গোপনে সাধন করিতে ও সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিব? আমি ভাল মন্দ জানি না। প্রকৃতি আমার সর্ব্বদাই বহির্মুখ; সর্ব্বদাই আত্ম-প্রকাশে আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, এ যে তত্ত্বের আভাস দিলে, তাহা অতি নিগূঢ়। এ বলা কঠিন, বোঝান কঠিন। অথচ, আমি এ মধুর বস্তু, নিজে ধরিয়াই বা রাখি কেমন করিয়া? তাই তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে চাই। আমায় একেবারে অধিকার কর। আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল গ্রহণ কর। যাতে সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য—তোমার চরণশরণাগত হইতে পারি, তাই কর। তা নইলে, আমার আর গতি নাই। গতি কর, দয়াল, গতি কর। তোমারই জয় গুরো! তোমারই জয়, তোমারই জয়। তুমি ধন্য, তোমার প্রেম, ধন্য, তোমার করুণা ধন্য, তোমার চরণাশ্রয় ধন্য।

সমাপ্ত